প্রথম আলো
বিশেষ ক্রোড়পত্র
বুধবার, ৬ নভেম্বর ২০২৪ | ২১ কার্তিক ১৪৩১
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ২০২৪

সামনের পথরেখা

সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে উত্তরণ চাইছে দেশের মানুষ। জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থান নতুন আলো ফেলেছে সবকিছুর ওপর স্বপ্নের চোখে দেখার জন্য। প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষ খুঁজছে মুক্তির উপায়। আমাদের নতুন প্রজন্মের লেখক ও গবেষকেরা দিয়েছেন সামনে এগিয়ে যাওয়ার নতুন পথের নিশানা।

প্রচ্ছদ : আনিসুজ্জামান সোহেল

ডাবল মিলিয়ন অফার
ওয়ালটন পণ্য কিনে পেতে পারেন
২০ লক্ষ টাকা
রয়েছে কোটি কোটি টাকার নিশ্চিত উপহার
শর্ত প্রযোজ্য

Digital Campaign 2024
Season-21

WALTON

মেসার্স সাজু এন্টারপ্রাইজ, গাংনী বাজার, মেহেরপুর থেকে
ফ্রিজ কিনে পেলেন
২০ লক্ষ টাকা
জনাব মোঃ রাশেদ আলী, পিতা: মোঃ রফিকুল ইসলাম
বাথানপাড়া, রাইপুর, গাংনী, মেহেরপুর

ওয়ালটন প্লাজা, গণেশতলা, দিনাজপুর থেকে
ফ্রিজ কিনে পেলেন
২০ লক্ষ টাকা
জনাব মোঃ রানা ইসলাম, পিতা: মোঃ নজরুল ইসলাম
লালবাগ, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর

ওয়ালটন প্লাজা, ময়মনসিংহ থেকে
ফ্রিজ কিনে পেলেন
১ লক্ষ টাকা
জনাব মোঃ ইফতিয়াখ খন্দকার, পিতা: মোঃ শাহাবুদ্দীন শাহীন
কাশর, ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ

ওয়ালটন প্লাজা, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর থেকে
ফ্রিজ কিনে পেলেন
১ লক্ষ টাকা
জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন, পিতা: নুরুল ইসলাম
মালাপাড়া, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর

শর্তাবলি:
- ওয়ালটন ফ্রিজ, টেলিভিশন, ওয়াশিং মেশিন এবং ফ্যান (বিএলডিসি টেকনোলজির যেকোনো মডেল) কিনে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।
- এই ক্যাম্পেইনটি নিরপেক্ষতার স্বার্থে সম্পূর্ণভাবে কম্পিউটারাইজড সিস্টেম দ্বারা পরিচালিত।
- ক্যাম্পেইনের আওতায় বিক্রিত পণ্যের ক্যাশমেমো, ওয়ারেন্টি কার্ড এবং রেজিস্ট্রেশন একই তারিখের হতে হবে। তারিখের ভিন্নতা থাকলে তা ক্যাম্পেইনের আওতাভুক্ত হবে না।
- ক্যাশ ভাউচার শুধুমাত্র ওয়ালটন পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ক্যাশ ভাউচার দ্বারা ক্রয়কৃত পণ্যের উপর পুনরায় অফার পেলে তা বাতিল হবে।
- নগদ টাকা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে উৎসে কর বাধ্যতামূলকভাবে কর্তন সাপেক্ষে অবশিষ্ট অংশ গ্রাহককে চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা হবে।
- কর্তৃপক্ষ যেকোনো সময় এই ক্যাম্পেইন পরিবর্তন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

এ উদ্যোগ পণ্যের গবেষণা ও মানোন্নয়ন এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ গ্রাহক সেবা নিশ্চিতকরণের প্রত্যয়ে।

প্রযুক্তিগত/নেটওয়ার্কজনিত কারণে SMS টি বিলম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে।

অফারটি চলবে ১০ অক্টোবর থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত।

For Details: 16267 | 08000016267 (Toll Free) | waltonbd.com

Mandatory in Europe for Product chemical compliance
Mandatory requirement for global market access
Mandatory in US & Canada as Product Safety Certification
ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 & ISO 45001: 2018 Certified Company
Bangladesh Standards and Testing Institution (Mandatory in Bangladesh for Product Conformity)

Daily ePapers
BD
Click here to join the channel

অভ্যুত্থান বড় সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে

আলী রীয়াজ

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান ও যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর

ভূমিকা

অভাবনীয় হত্যাযজ্ঞ এবং অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে এমন এক বাংলাদেশ, যা এখন দাঁড়িয়ে আছে সম্ভাবনা ও উদ্বেগের মাঝখানে। বাংলাদেশে ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান তাকে অপসারণ করেছে, শেখ হাসিনা দেশ থেকে পলায়নে বাধ্য হয়েছেন। বহু প্রাণের বিনিময়ে যা অর্জিত হয়েছে, তা হচ্ছে সম্ভাবনা—বাংলাদেশ রাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের রাজনীতিকে ঢেলে সাজানোর সম্ভাবনা।

যেকোনো পরিবর্তন যেমন সম্ভাবনা তৈরি করে, তেমনি তৈরি করে অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগ। সারা বিশ্বের দীর্ঘ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে বিপ্লব এবং সাধারণ জনগণের অভ্যুত্থান, বিশেষ করে যেগুলো সাফল্য লাভ করেছে, সেগুলো স্থিতাবস্থাকে ভেঙে ফেলতে উদ্যত হয়। ফলে সেগুলো পরিবর্তনের অব্যবহিত পরেই, অবিলম্বে একধরনের স্থিতিশীলতা তৈরি করে না। পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি যত গভীর ও ব্যাপক, তাকে কেন্দ্র করে উদ্বেগ ও আশঙ্কা ততই ব্যাপক হয়। এর কারণ দুটি : প্রথমত, জনপ্রত্যাশা; দ্বিতীয়ত, এই পরিবর্তনের প্রতিপক্ষের ভূমিকা।

ব্যাপক পরিবর্তনে জনপ্রত্যাশা সৃষ্টি হয় দুভাবে। প্রথমত যাঁরা এই পরিবর্তনের নেতৃত্বে থাকেন, তাঁরা পরিবর্তনের আগে থেকেই এই ধারণা দেন যে তাঁরা কী ধরনের বদল চাইছেন। ফরাসি বিপ্লব তার অন্যতম উদাহরণ। তবে সবচেয়ে সহজবোধ্য উদাহরণ হচ্ছে বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবগুলো; যার অন্যতম হচ্ছে রাশিয়া, চীন ও ভিয়েতনাম। ফলে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া যা-ই হোক—তা যত দীর্ঘ বা হ্রস্বই হোক না কেন—নাগরিকেরা জানেন, পুরোনো ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বদলে যাবে। আর সেটাই জন-আকাঙ্ক্ষায় রূপ নেয়।

জনপ্রত্যাশা তৈরির আরেকটি পথ হচ্ছে যখন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা এতটাই বৈষম্যমূলক, জনবিচ্ছিন্ন এবং নিপীড়নমূলক হয়ে ওঠে যে এর পতনের পর সাধারণ মানুষের মধ্যে এই আশা তৈরি হয় যে যাঁরা দায়িত্বে আসীন হয়েছেন, তাঁরা পুরোনো ব্যবস্থাটাকে এমনভাবে বদলে ফেলবেন, যেন নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার স্থায়ী অবসান ঘটে। এ ধরনের পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় সাধারণত স্বতঃস্ফূর্ত গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাসীনদের অপসারণ ঘটলে।

গত কয়েক দশকে বিভিন্ন দেশে এ ধরনের গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে। তিউনিসিয়া (২০১১), মিসর (২০১১), আলজেরিয়া (২০১৯-২১), বেলারুশের (২০২১-২২) আন্দোলনগুলো এ ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত গণ-অভ্যুত্থানের উদাহরণ। বেলারুশের ক্ষেত্রে সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা থাকলেও এই আন্দোলনের ব্যাপকতা প্রমাণ করে যে এতে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ ছিল প্রধান দিক। তিউনিসিয়া, মিসর ও আলজেরিয়ার আন্দোলনের সাফল্য বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা আছে, কিন্তু এটা লক্ষণীয় যে এসব অভ্যুত্থান ঘটেছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এগুলো তৎকালীন ক্ষমতাসীন স্বৈরাচারী শাসকদের অপসারণ করতে সক্ষম হয়েছিল এবং রাষ্ট্রকাঠামো বদলের সম্ভাবনা তৈরি করেছিল। এ আশাবাদ পূরণ হয়নি; কিন্তু জন-আকাঙ্ক্ষা যে ব্যাপক ছিল, সেটা অনস্বীকার্য। চরিত্র ও প্রকৃতি বিবেচনায় এসব আন্দোলন ষাটের দশকে

> এ ধরনের সম্ভাবনার মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ যেকোনো রাষ্ট্রের জন্যই বিরল। বাংলাদেশের জন্য ৫২ বছর পর সে সুযোগ ও সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে তৈরি হয়েছে বিপুল জন-আকাঙ্ক্ষা, সূচিত হয়েছে সম্ভাবনার নতুন পথ। ৩ জুলাই ২০২৪। ছবি : সাজিদ হোসেন

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে ছাত্র আন্দোলন হয়েছিল, তার থেকে ভিন্ন। ষাটের আন্দোলনের লক্ষ্যকে এই বিবেচনায় সীমিত বলেই বলা যায়। বাংলাদেশে ১৯৯০ সালের গণ-অভ্যুত্থানও তুলনামূলকভাবে কম পরিবর্তনের প্রত্যাশা তৈরি করেছিল।

২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থান এমন একটি আকাঙ্ক্ষা তৈরি করেছে যে তা কেবল সাময়িকভাবে স্বৈরতন্ত্রকে পরাজিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। স্মরণ করা যেতে পারে যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা 'নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের' কথা বলেছিলেন। এ আহ্বানের কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে শেখ হাসিনার যে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন, তা দুএক বছরে তৈরি হয়নি। স্বৈরতন্ত্রের ব্যক্তিকরণ ঘটেছে ধীরে ধীরে, কিন্তু দৃশ্যমানভাবেই। একদিকে তা ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে এক ব্যক্তিকে স্থাপন করেছে, যার ক্ষমতার ভিত্তি হচ্ছে শক্তি প্রয়োগ। কিন্তু কেবল শক্তি প্রয়োগের দিকটি দেখলে এর গভীরতা বোঝা যাবে না। এই শাসন তৈরি করা হয়েছে একাদিক্রমে সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা এবং ক্লেপ্টোক্রেসি বা লুটপাটতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এই লুটপাটতন্ত্রের একটি বড় প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুরের সাম্প্রতিক বক্তব্যে, 'শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীরা তাঁর শাসনামলে দেশটির একটি গোয়েন্দা সংস্থার কিছু সদস্যের সঙ্গে যোগসাজশ করে ব্যাংক খাত থেকে ১ হাজার ৭০০ কোটি ডলারের সমপরিমাণ অর্থ সরিয়েছেন' (*প্রথম আলো*, ২৮ অক্টোবর ২০২৪)।

সহজেই অনুমেয় যে এই হিসাব আংশিক। কিন্তু যেটা লক্ষণীয়, সেটা হচ্ছে কীভাবে রাষ্ট্রযন্ত্র এই লুটপাটের অংশীদার হয়েছে। এটা কেবল অর্থনীতির ক্ষেত্রে হয়েছে, তা নয়। রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গ এবং প্রতিষ্ঠানকেই ব্যবহার করা হয়েছে লুটপাটের জন্য—নাগরিকের ভোটাধিকার থেকে শুরু করে নাগরিকের বেঁচে থাকার অধিকার পর্যন্ত। এর ফলে রাষ্ট্রের চরিত্র আর 'রাষ্ট্র' বলেই দৃশ্যমান হয় না। অথচ এগুলোকে একধরনের আইনি এবং সাংবিধানিক বাতাবরণ দেওয়া হয়েছে।

এই পটভূমিতেই ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের জনপ্রত্যাশা হচ্ছে এই ব্যবস্থা যেন অব্যাহত না থাকে, এই রকম ব্যবস্থা যেন আবার ফিরে না আসে, তা রোধের স্থায়ী পথ তৈরি করা। সে জন্য দরকার প্রতিটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে পুনর্গঠন করা। গণ-অভ্যুত্থান সেই সম্ভাবনা তৈরি করেছে। অন্তর্বর্তী সরকার সেই আকাঙ্ক্ষার অংশ হিসেবেই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার করতে উদ্যোগী হয়েছে। রাষ্ট্রের ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্গঠন জরুরি কাজ। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলো 'সংস্কার' ভবিষ্যতে আবার ফ্যাসিবাদ উত্থান রোধ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না গত ১৬ বছরের এই ব্যবস্থার আরও দুটি দিকের নজর দেওয়া হয়। একটি হচ্ছে এই ব্যবস্থা গড়ে ওঠার রাজনৈতিক বা আদর্শিক ভিত্তি; দ্বিতীয়টি হচ্ছে এই ধরনের শাসন বৈধকরণের আইনি ও সাংবিধানিক প্রক্রিয়া। কীভাবে এগুলো বাংলাদেশের রাষ্ট্রকেই দুর্বল করে ফেলেছে, এক ব্যক্তির অধীন করেছে, সেটা বোঝা এবং সেগুলো মোকাবিলার বিষয় রাজনৈতিক শক্তির কাজ।

প্রথমটি করার ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের বাধা প্রায় অলঙ্ঘনীয়; যতক্ষণ পর্যন্ত না দেশের নতুন এবং পুরোনো গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তি তা উপলব্ধি করবে, এই আদর্শিক লড়াই ততই দুর্বল হয়ে পড়বে। অন্তর্বর্তী সরকার দ্বিতীয়টির সূচনা করতে পারে, দিকনির্দেশনা দিতে পারে, প্রস্তাব করতে পারে, অংশত বাস্তবায়নও করতে পারে, কিন্তু এগুলো বাস্তবায়নের জন্য দরকার হবে একধরনের গাইড বা ভিশন, দরকার হবে অংশীদার হিসেবে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর প্রত্যক্ষ ও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব।

এ ধরনের সম্ভাবনার মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ যেকোনো রাষ্ট্রের জন্যই বিরল। বাংলাদেশের জন্য ৫২ বছর পর সে সুযোগ ও সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আপাতদৃষ্টে আমাদের জীবনযাপনের যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, তাতে প্রতিদিন এই সম্ভাবনা হয়তো মূর্ত হয়ে উঠছে না, কিন্তু সেই বাস্তবতাকে অস্বীকার করা জাতির ভবিষ্যতের জন্যই ক্ষতিকর। যাঁরা সরকারের প্রাত্যহিক কাজে ব্যস্ত এই দায়িত্ব কেবল তাঁদের নয়; গত দশকগুলোতে যাঁরা গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছেন, এই দায়িত্ব তাঁদেরই বেশি।

এই সম্ভাবনাগুলো যেমন আছে, তেমনি আছে উদ্বেগ। উদ্বেগের কিছু বিষয় প্রাত্যহিক, সেটার মধ্যে আছে দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যাচ্ছে কি না, দ্রব্যমূল্য কমছে কি না, নাগরিকেরা নিরাপদ বোধ করছেন কি না, সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বড় আকারে উদ্বেগের জায়গা হচ্ছে পরাজিত শক্তির ভূমিকা। রাজনৈতিক দল হিসেবে কেবল আওয়ামী লীগই যে এই সম্ভাবনার বাস্তবায়নে বাধা, তা নয়। ক্লেপ্টোক্রেটিক ব্যবস্থার যাঁরা সুবিধাভোগী ছিলেন—রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বাইরে ও ভেতরে—তাঁরাও একই উদ্দেশ্যে সক্রিয় থাকবেন, সেটাই স্বাভাবিক। এগুলো সহজেই চিহ্নিত করা যায়। এর সঙ্গে সহজেই দৃষ্টিগ্রাহ্য হচ্ছে ভারতের ভূমিকা। বাংলাদেশের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে চলা সম্পর্কের অসমতা এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার কারণে ভারতের এস্টাবলিশমেন্ট যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে, তাকে বিরূপ বলাও ছোট করে বলা।

কিন্তু সম্ভাবনা বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হতে হলে যে উদ্বেগের জায়গাটি মোকাবিলা করতে হবে, তা হচ্ছে যারা জুলাই-আগস্টের অভাবনীয় হত্যাযজ্ঞে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন, হুকুম জারি করেছেন তাঁদের এবং যাঁরা ১৬ বছর ধরে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের কীভাবে জবাবদিহির আওতায় আনা হবে। এই ক্ষেত্রে প্রকৃত অপরাধীদের বিচারের মুখোমুখি করার প্রশ্ন আছে, আবার অন্যদিকে আছে বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে প্রতিহিংসার পথ রুদ্ধ করে দেওয়া। যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের স্বজনদের এবং যাঁরা নিপীড়ন ভোগ করেছেন তাঁদের ন্যায়বিচারের প্রত্যাশা পূরণ করা ছাড়া অগ্রসর হওয়ার পথ সীমিত।

দেশসেরা টেকসই ব্যাংক

BRAC BANK
আস্থা অবিচল

আমরা একটি মূল্যবোধ-নির্ভর ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণে অবদান রাখবে। আমাদের লক্ষ্য হলো সবার জন্য একটি সুন্দর ও টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা।

স্যার ফজলে হাসান আবেদ
প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপারসন

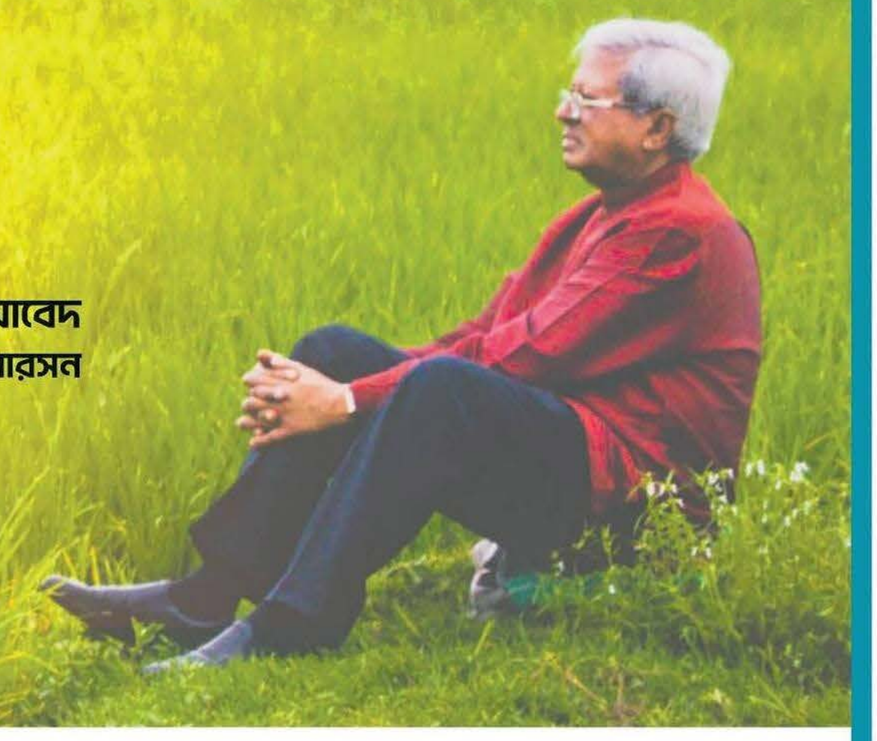

সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্ট ২০২৩ ডাউনলোড করুন

মূল্যবোধ

শুদ্ধাচার । উদ্ভাবন । অন্তর্ভুক্তি । গ্রাহক-কেন্দ্রিকতা । কার্যকারিতা

সুশাসন

- ৯,৫৯২ কোটি টাকা নিয়ে ব্যাংকিং খাতে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনে শীর্ষে
- ৬৭% স্বতন্ত্র পরিচালক, যা দেশের ব্যাংকিং খাতে সর্বোচ্চ
- ব্যাংকিং খাতে সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের শেয়ারহোল্ডিং, ৩২%
- করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং লিমিট ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ব্যাংকিং খাতের সর্বোচ্চ
- ৪ বছর ধরে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাসটেইনেবিলিটি রেটিংয়ে সেরা

দায়িত্বশীল অর্থায়ন

- ৬.৩১ লাখ নারী গ্রাহকের মাঝে ১০,৮৮৮ কোটি টাকা অর্থায়ন
- সামাজিক অর্থপূর্ণ প্রকল্পে অর্থায়ন (সিএমএসএমই) ২৩,৫০৭ কোটি টাকা, যা বাংলাদেশে সর্বোচ্চ
- সবুজ ও জলবায়ু অর্থায়ন: ৮,৩৬৯ কোটি টাকা
- ২ যুগ ধরে ১৪ লক্ষ তৃণমূল গ্রাহককে ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকা সিএমএসএমই ঋণ বিতরণ

পোর্টফোলিও বৈচিত্র্য

গ্রাহক আমানত	গ্রাহক ঋণ
রিটেইল: ৪৮%	রিটেইল: ১৬%
কর্পোরেট: ৩২%	কর্পোরেট: ৪৩%
এসএমই: ২০%	এসএমই: ৪১%

ধারাবাহিক আর্থিক সাফল্য

- ডিপোজিট, ঋণ ও মুনাফায় ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি
- সবচেয়ে কম খেলাপি ঋণের ব্যাংক
- ব্যাংকিং খাতে কোর ক্যাপিটালে শীর্ষে
- দেশি ও বৈদেশিক মুদ্রায় পর্যাপ্ত তারল্য

ক্রেডিট রেটিং

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রেডিট রেটিংয়ে দেশসেরা

Moody's Investors Service	S&P Global Ratings	CRAB
B1	B+	AAA

রাষ্ট্র সংস্কার এবং রাষ্ট্রে ভিন্ন জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্তি

সতেজ চাকমা

লেখক; আদিবাসী অধিকারকর্মী

ভিন্ন জাতিসত্তা

> বাঙালি ছাড়া অন্য যে জাতিগুলো রয়েছে, তাদের জীবন ও যাপন খুব একটা সুবিধার মধ্যে নেই। তারা আদিবাসী, না ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, না উপজাতি, না সম্প্রদায়—তার সঠিক ফয়সালা রাষ্ট্র এখনো করতে পারেনি।

৫৩ বছর বয়সী একটা দেশে নানা ধর্মের, নানা ভাষার, নানা জাতি ও সংস্কৃতির বহু মানুষের বসবাস। তবে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে গোড়াপত্তনের পর থেকেই আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের চৌহদ্দিতে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, জাতিগত ও সাংস্কৃতিকভাবে ভিন্ন মানুষের বিকাশ সুষমভাবে সম্পন্ন হয়নি। বাঙালি ছাড়া অন্য যে জাতিগুলো রয়েছে, তাদের জীবন ও যাপন খুব একটা সুবিধার মধ্যে নেই। তারা আদিবাসী, না ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, না উপজাতি, না সম্প্রদায়—তার সঠিক ফয়সালা রাষ্ট্র এখনো করতে পারেনি। এখনো পরিচয় নির্মাণের লড়াইয়েই ব্যস্ত আদিবাসী মানুষ। এর সঙ্গে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামও তাড়া করছে তাদের। প্রতিনিয়ত ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের আতঙ্ক, বাস্তুভূমি হারানোর যন্ত্রণা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, অর্থনৈতিক দৈন্যদশা আর নানাভাবে পীড়নের অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই যাচ্ছে তারা।

সাম্প্রতিক জুলাই অভ্যুত্থান এ দেশের অধিকাংশ মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়েছিল। ঠিক তেমনি আদিবাসী মানুষের মনের ভেতরও আশা জাগিয়েছিল এই অভ্যুত্থান। তারাও এই পরিবর্তনকে ইতিবাচক বদলের ক্ষণ হিসেবে দেখতে শুরু করেছিল। কারণ, বিগত ১৫ বছরের আওয়ামী শাসনও আদিবাসী মানুষের জীবনকে নিরাপত্তা দিতে কার্যত ব্যর্থ হয়েছে। আওয়ামী শাসনের মধ্যেই আদিবাসী মানুষকে ন্যক্কারজনক পঞ্চদশ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে ২০১১ সালে বানানো হয় ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী। যদিও ওই সংশোধনীতে জাতিগোষ্ঠী, সম্প্রদায়, উপজাতিসহ নানা অভিধা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সরকারি নথিপত্রে প্রায়ই ব্যবহার করে হচ্ছে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' শব্দটি। অপমানজনক বলে আদিবাসীসহ এ দেশের প্রগতিশীল ও বোদ্ধা সমাজ এটি প্রত্যাখ্যান করেছিল।

উত্তরবঙ্গের দিকে তাকালে দেখা যায়, গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার মানুষের ভূমি থেকে উচ্ছেদের যন্ত্রণা। ২০১৬ সালের নভেম্বরে তিনজন সাঁওতালকে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর গুলিতে মারা যেতে হলো। আমরা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে দেখলাম রাষ্ট্রীয় বাহিনীর হাতে পুড়ছে দারিদ্র্যপীড়িত সাঁওতাল মানুষের খড়ে বানানো কুটির। তাদের হাতেই চোখ হারাতে হলো দ্বিজেন টুডুকে। দক্ষিণবঙ্গে সাতক্ষীরায় মুন্ডা জীবনের হাহাকার চোখে পড়ে। যে মুন্ডারা সুন্দরবনকে এত দিন আগলে রেখেছিল, সেখানকার জমিকে আবাদযোগ্য করেছিল, তারাই আজ সে অঞ্চলে নিজভূমে পরবাসী। ভূমিখেকোদের সঙ্গে বাস্তুভূমি রক্ষার লড়াই এবং লবণাক্ততার সঙ্গে নিয়ত জীবিকার সংগ্রাম। বরগুনা ও পটুয়াখালী অঞ্চলের রাখাইনদের অবস্থা আরও করুণ। ১৯৬০-এর দশকে যাঁদের সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার, তাঁদের সংখ্যা এখন আড়াই হাজারে নেমে এসেছে। আওয়ামী আমলের চটকদারি 'উন্নয়নে' ভেসে গেছে রাখাইনদের বহু পুরোনো জনপদ। পটুয়াখালীতে পায়রা তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনার ফলে রাখাইনদের ২০০ বছরের পুরোনো গ্রাম উচ্ছেদ করা হয়েছে। সরকারের পানি উন্নয়ন বোর্ড দখলে ব্যস্ত রাখাইনদের বৌদ্ধমন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি। স্থানীয় ভূমিদস্যুরা বারবার রাখাইন আদিবাসীদের পবিত্র শ্মশান ভূমি পর্যন্ত দখলের চেষ্টায় রত। সিলেটের মৌলভীবাজার ও শ্রীমঙ্গল অঞ্চলের খাসিয়ারা প্রতিনিয়ত পান জুম হারানোর ভয়ে সন্ত্রস্ত। ভূমিখেকোদের ক্রমাগত আক্রমণ ও বিচারহীনতায় দেশান্তরি হচ্ছে তারা।

বাংলাদেশের সমতল ও পাহাড়ে রয়েছে বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের উপস্থিতি। বান্দরবানের একটি স্কুলের দেয়ালে আঁকা গ্রাফিতি। ১৪ আগস্ট ২০২৪। ছবি : মংহাইসিং মারমা

পাহাড়ের দিকে তাকালে দেখা যায়, নিরাপত্তার নামে পার্বত্য চট্টগ্রামকে রীতিমতো অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। পার্বত্য সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২২ বছর পেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই চুক্তির মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে আদিবাসী মানুষের জীবন বদলের যে প্রতিশ্রুতি এ রাষ্ট্র করেছিল, তা ক্রমেই ফিকে হয়ে যাচ্ছে প্রতারণার জালে। তিন জেলা পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ শাসনব্যবস্থার অধীনে আদিবাসী মানুষের কার্যকর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের কথা থাকলেও ২৭ বছর পেরিয়ে এর কোনো প্রতিফলন আমাদের চোখে পড়ছে না। বরং একধরনের কৃত্রিম সংঘাত জিইয়ে রেখেছে এই রাষ্ট্র।

শত হতাশা, সংকট আর হাহাকারের মধ্যে আদিবাসীরা বাস্তুভূমি আঁকড়ে ধরে টিকে থাকার সংগ্রাম করছে। বিগত ৫৩ বছরে যতবার নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জমাট বেঁধেছে ততবারই তারা তাতে সোচ্চার হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে তারা অংশ নিয়েছে। সাম্প্রতিক জুলাই অভ্যুত্থানে আদিবাসী তরুণদের সক্রিয়তা সে কথারই সত্যতাকে তুলে ধরে। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের ঠিক দুদিন আগে (৩ আগস্ট) শহীদ মিনার থেকে শুরু হওয়া মিছিলে কিছু আদিবাসী শিক্ষার্থীর ব্যানারের কথা মনে পড়ছে। ব্যানারে লেখা ছিল 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, সেনাশাসন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম মুক্তি পাক'। গণ-অভ্যুত্থানের প্রাথমিক যে সফলতা—স্বৈরাচারকে বিদায় করা, সেটা সম্পাদন হয়েছে। কিন্তু স্বৈরাচার বিদায় নিলেও পাহাড় মুক্ত করার কার্যকর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বরং আমরা সাম্প্রতিক সময়ে পাহাড়ে আদিবাসীদের ওপর সাম্প্রদায়িক হামলা হতে দেখছি। যারা নিরাপত্তার দায়িত্বে আছে, তারা নির্বিকার ভূমিকা পালন করছে।

দেশের সব সংকটে আদিবাসী মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ থাকলেও রাষ্ট্র তাদের কার্যকরভাবে নিজেদের নীতিনির্ধারণী ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। সংবিধান প্রণয়নের সময়ও তা হয়েছিল। স্বাধীনতার পরপরই সংবিধান প্রণয়নের সময় পাহাড় থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা আদিবাসীসহ মেথর, পতিতা, বেদে, ভবঘুরে, শ্রমিক, মজুরের কথা সেদিনকার নীতিনির্ধারক সভায় তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবল জাত্যভিমানের মুখে সংবিধানের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদের ধারা (২)-এ আদিবাসীদের 'বাঙালি' করে রাখা হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর নানা ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করলেও সেখানে আমরা আদিবাসী প্রতিনিধিত্ব দেখলাম না। সত্যিকার অর্থে অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত বাংলাদেশের বহুত্ববাদকে স্বীকার করে নিয়ে সংবিধানে আদিবাসীদের সম্মানজনক স্বীকৃতি প্রদান এবং তাদের প্রথাগত ভূমি অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া।

বাংলাদেশের সংবিধানে তিন ধরনের মালিকানা—ব্যক্তিমালিকানা, সমবায় মালিকানা ও রাষ্ট্রমালিকানা স্বীকৃত হলেও আদিবাসীদের হাজার বছরের চর্চিত সামষ্টিক মালিকানাকে এই রাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয়নি। ফলে প্রথাগত ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর আদিবাসীদের যে ঐতিহ্যগত অধিকার, সেটা ক্রমাগত খর্ব করছে রাষ্ট্রীয় ও করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো এবং বিভিন্ন প্রভাবশালী মহল। কাজেই আদিবাসীদের ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সেসবের ব্যবস্থাপনার ওপর যে অধিকার, সেটা নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ (১৩)-এর মালিকানার ধারায় 'সামষ্টিক মালিকানা'ও সন্নিবেশিত করা জরুরি। অন্যদিকে আমাদের সামনে খুবই মৌলিক ও জরুরি প্রশ্ন হচ্ছে—আমরা প্রকৃত অর্থেই বাংলাদেশকে একটি বহু ধর্মের, বহু সংস্কৃতির দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই কি না। যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তবে সংবিধানের ২(ক) ধারার রাষ্ট্রধর্ম ইসলামকে সংশোধন করে ১৯৭২ সালের সংবিধানের চার মূলনীতির মধ্যে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে পুনঃপ্রতিস্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া। এর অর্থ এই নয় যে রাষ্ট্রের নাগরিকেরা ধর্ম পালন করবেন না। মূলত এই সংশোধনীর মূল চেতনা হলো—ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে যেন কোনো নাগরিক কোনোভাবে বৈষম্যের শিকার না হয়, তার নিশ্চয়তা প্রদান।

অন্যদিকে সংবিধানের ২৩(ক) ধারাকে সংশোধন করে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী, উপজাতি, সম্প্রদায়—সব শব্দের পরিবর্তে 'আদিবাসী' শব্দ প্রতিস্থাপন করে প্রকৃত অর্থে আদিবাসীদের মর্যাদার সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে তাদের যে বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি, সেটিকে রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

মনে রাখতে হবে, পার্বত্য সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য যে পার্বত্য চুক্তি হয়েছিল, তার মধ্য দিয়েই রাষ্ট্র এবং আদিবাসী জনগণের মধ্যে একটি সমঝোতা হয়েছে এবং ঐতিহাসিকভাবে নিপীড়নের যে ইতিহাস, সেটিকে স্বীকার করে নিয়ে পাহাড়ের আদিবাসীদের সামগ্রিকভাবে এগিয়ে নেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়েছে। সেই চুক্তির সফল বাস্তবায়ন আমরা আগামী সরকারগুলোর কাছে দেখতে চাই। অন্যদিকে পার্বত্য চুক্তিকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে এই চুক্তির সাংবিধানিক নিশ্চয়তা প্রদান করাও আগামীর নীতিনির্ধারকদের একটি মৌলিক উদ্যোগ হওয়া দরকার।

পার্বত্য চুক্তির বদৌলতে পাহাড়ের আদিবাসীদের বিভিন্ন বিষয় দেখভাল করার জন্য একটি পৃথক মন্ত্রণালয় রয়েছে। সেই মন্ত্রণালয়ের অধীনে পাহাড়ের মানুষের নানা সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ার একটি কাঠামো তৈরি হলেও সমতলে বসবাস করা আদিবাসীদের জন্য সে রকম কোনো কার্যকর কাঠামো রাষ্ট্র এখনো গড়ে তুলতে পারেনি। কিন্তু সব মানুষের আকাঙ্ক্ষার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অভিযাত্রায় সমতলের আদিবাসী-সম্পর্কিত বিষয়গুলো দেখার জন্য একটা পৃথক মন্ত্রণালয় কিংবা একটি পৃথক কমিশন গঠনও জরুরি। এই মন্ত্রণালয় বা কমিশনের মাধ্যমে রাষ্ট্র সমতলের আদিবাসীদের ভূমি অধিকারসহ সামগ্রিক ক্ষেত্রে তাঁদের এগিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। শুধু কাঠামো গঠন করে ঝিমিয়ে পড়লে হবে না, রাজনৈতিক সদিচ্ছার মধ্য দিয়ে আদিবাসীদের ভূমিসহ মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে সোচ্চার ভূমিকা অবশ্যম্ভাবী।

প্রাথমিক এসব উদ্যোগই হতে পারে একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও বহুত্ববাদী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রথম এবং মৌলিক পদক্ষেপ, যা এত দিন কোনো সরকারই নেয়নি।

বিকাশ
বিকাশ-এ টাকা লাগবে যখনই
ব্যাংক ও কার্ড থেকে
হবে অ্যাড মানি
অ্যাড মানি
৪৫+ ব্যাংক একাউন্ট ও অ্যাপ
৩ ধরনের কার্ড
VISA
mastercard
AMEX

দেশটা হোক সবার

সাঈদ ফেরদৌস

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক; দেশভাগ-বিষয়ক গবেষক

গণ-অভ্যুত্থান জাতীয়তাবাদের পুরোনো বয়ানকে যেন ছুড়ে ফেলেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে উসাইদ মুহাম্মাদের আঁকা একটি গ্রাফিতি। ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪। ছবি : শাহাদাৎ হোসেন

জাতীয়তাবাদ

> জাতীয়তাবাদ তথা যেকোনো পরিচিতিনির্ভর রাজনীতির একটা সংকট হলো পরিচয় গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটাই একাধারে গ্রহণ ও বর্জনমূলক। যেমন বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাঙালি নয়, কিংবা তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক—এমন সব পরিচয় ও বর্গকে পর করে, তা সে মুসলমান, বিহারি, চাকমা, যা-ই হোক না কেন।

এই অগ্নিঝরা বর্ষায় ঘটে যাওয়া যে গণ-অভ্যুত্থান, তার নেপথ্যে কোনো জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা অনুঘটক হিসেবে মুখ্য হয়ে উঠেছিল, এমন নয়। দীর্ঘ স্বৈরাচারী অপশাসনের বিরুদ্ধে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া জনমানুষের ক্ষোভের উদ্‌গিরণ এই আন্দোলনে আকার পেয়েছিল। কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে স্বৈরশাসন বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে হেজেমনি জারি রাখতে চেয়েছিল, এই আন্দোলন শাসকের অনেক অনুষঙ্গের মতো সেটিকেও ছুড়ে ফেলে দেয়।

আমার মতে, বাঙালি জাতীয়তাবাদ দাঁড়িয়েছিল অন্তত দুটি ভুল পূর্বানুমানের ওপর : ক. ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে মানুষ ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে রায় দিয়েছে; এবং খ. জাতিরাষ্ট্রের সীমানা ছাপিয়ে বাঙালির অভিন্ন একটি সত্তা রয়েছে। এ দুই পূর্বানুমানই ছিল অর্ধসত্য।

প্রথম পূর্বানুমানের প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করা যাক। এই ভূখণ্ডের মানুষ ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ছেড়ে এসেছেন। তার অর্থ এই নয় যে তাঁরা নিজেদের মুসলমান সত্তাকে রহিত করেছেন বা মুসলিম পরিচয় ছেড়ে এসেছেন।

ধর্মনিরপেক্ষতাকে আমরা যারা শুভ বা কল্যাণকর বলে বিবেচনা করেছি, তারা মূলত ছিলাম বাঙালি জাতীয়তাবাদের ফুট সোলজার—শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। কিন্তু এই শ্রেণিগত ধর্মনিরপেক্ষতার আকাঙ্ক্ষা কখনোই আপামর জনমানুষের চাওয়া হয়ে ওঠেনি। সত্যি কথা হলো, জনমানুষের কাছে ধর্মনিরপেক্ষতার মর্মবাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে ধরনের সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজন ছিল—সেক্যুলার শাসকদল কিংবা তাদের অনুসারীদের দিক থেকে কখনোই তেমন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

এবারে আসা যাক দ্বিতীয় পূর্বানুমান, অর্থাৎ অভিন্ন বাঙালিত্বের প্রসঙ্গটিতে। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি বলে যেসব মানুষ বাস করেন, তাঁদের মধ্যে ঐক্য ও সাদৃশ্য অবশ্যই ছিল। সীমান্তের দুই পারে বসবাসরত এসব মানুষ—বহু বছর ধরে পরস্পরের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ভাগাভাগি করে চলছিলেন। সাতচল্লিশের আগে তাঁরা তো একই দেশের বাসিন্দাই ছিলেন। এমনকি সাতচল্লিশে সীমান্তরেখায় বিভাজিত হওয়ার পরও তাঁরা একে অন্যের কাছ থেকে দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়েই বিকশিত হয়েছেন। সেই দেওয়া-নেওয়া যদিও কোনোভাবেই সহজাত ছিল না—সমপর্যায়ীও ছিল না। কিন্তু এই ঐক্য ও সাদৃশ্যের ব্যাপারটা বিশেষ করে রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন সাতচল্লিশের দেশভাগের পর পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে পূর্ববঙ্গ-পূর্ব পাকিস্তান বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং তার প্রতীক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে খুবই কার্যকরভাবে সামনে নিয়ে আসে।

অখণ্ড পাকিস্তানের অস্তিত্বের দুই যুগজুড়েই যে আতঙ্ক পাকিস্তানি শাসকদের তাড়া করে ফিরছিল, তা হচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা যেকোনো সময়েই পশ্চিমবঙ্গের, তথা ভারতের বাঙালিদের সঙ্গে গিশে যাবে। এই অঞ্চলে বিরাজমান 'ঐক্যবদ্ধ বাংলা'র আওয়াজকে পাকিস্তানি শাসকেরা ভারতীয় ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখতে পেয়েছিলেন এবং সেই ষড়যন্ত্র রুখতে সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের পরমুহূর্ত থেকে তাঁরা অজস্র প্রকাশনা নিষিদ্ধ, বাজেয়াপ্ত করা—এসব সব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। সে সময় নব্য বিকাশমান বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থানের ডামাডোলে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল সীমান্তরেখার দুই পারের দুই বাংলার মধ্যকার ঐতিহাসিক ভিন্নতা, যার সামাজিক ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য অপরিসীম।

সীমান্তের দুই পারে ভাষাগত ঐক্য ও সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য সত্ত্বেও দুই বাংলার উৎপাদনব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক শ্রেণি গঠনপ্রক্রিয়ার মধ্যে বড়সড় ভিন্নতা দেখা দিয়েছিল শাসনকেন্দ্র হিসেবে ব্রিটিশদের হাতে তিলোত্তমা কলকাতা গড়ে ওঠার সময় থেকে। বাংলার পুরোনো কেন্দ্র ঢাকাকে ছাপিয়ে কলকাতা হয়ে ওঠে শিক্ষা, চাকরি ও শিল্পচর্চার প্রাণকেন্দ্র। কলকাতায় যখন বেতনভোগী চাকরিজীবী মধ্যবিত্ত বিকশিত হচ্ছিল, গ্রামীণ পূর্ববঙ্গ তখন ছিল দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত বৃহৎ এক কৃষকসমাজ। শিক্ষা কিংবা সাহিত্যকেন্দ্রিক বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন গড়ে ওঠার পটভূমি তখনো পূর্ববঙ্গে দেখা দেয়নি।

ভিন্নতার আরেকটি ফল্টলাইন আঁকা হয়ে গিয়েছিল শিল্প-সাহিত্যের দুনিয়ায়। বাঙালি মুসলমান লেখক-সমালোচকেরা, যাঁদের অধিকাংশই আবার পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় গিয়ে জড়ো হয়েছিলেন, তাঁরা লক্ষ করলেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মুসলমান লেখকদের অবদান চিরাচরিতভাবে অনুক্তই রয়ে গেছে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ একবার এমনটাও বলেছিলেন, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের আসরে গেলে মনে হয় মুসলমান সাহিত্যিকেরা যেনবা বড়লোক আত্মীয়ের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে এসেছেন। এই বাঙালি মুসলমান লেখক-বুদ্ধিজীবীদের একাংশই পাকিস্তান আন্দোলনে শরিক হয়েছিলেন, যাঁরা একাধারে দুটি পরিচয়কেই সামনে এনেছিলেন—বাঙালি ও মুসলমান। পরবর্তী সময় পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অকস্মাৎ উত্থানের ফলে পরিচয়ের স্মারক হিসেবে ধর্ম তার গুরুত্ব হারাল। রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের দাবি তুলে পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি পরিচয়টা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল।

এই যে ভিন্নতার ঐতিহাসিক পটভূমি, তা কিন্তু সীমান্তরেখায় বিভক্ত দুই বাংলার আদান-প্রদানে গুরুতর ভূমিকা রেখেছিল। দুই বাংলার আদান-প্রদান বরাবরই ছিল অসম, উচ্চম্মন্য ও হীনম্মন্যের মধ্যকার বিনিময়, ব্রিটিশ আমলের অবিভক্ত বাংলার কালেও পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববঙ্গকে ভেবেছে পাণ্ডববর্জিত এক জনপদ, যেখানে শিক্ষা, কৃষ্টি বা সহবতের কোনো ধারা তৈরি হয়নি। উল্টো দিকে পূর্ববঙ্গ ও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের বড় একটা অংশও সব সময়ই কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গকে শিল্প ও সাহিত্যে উচ্চতর ও অগ্রগণ্য জ্ঞান করে এসেছে—তাদের স্বীকৃতির আশায় থেকেছে।

১৯৭১ সালে সংঘটিত মুক্তিযুদ্ধ ও পাকিস্তানকে প্রত্যাখ্যান—এ দুইয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালিত্ব বাংলাদেশের শিক্ষিত মহলে পরিচয়ের স্মারক হিসেবে যে নিরঙ্কুশ নৈতিক আধিপত্য কায়েম করে, তার ভেতরে অভিন্ন বাঙালিত্বের উদ্‌যাপন হয়ে ওঠে একটা বড় উপাদান। ফলে যাঁরা বাংলাদেশে পরিচয়ের অপরাপর স্মারকগুলোর গুরুত্বের কথা বলতে চেয়েছেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের কারণে তাঁরাও বর্গ হিসেবে 'বাঙালি'র নিরঙ্কুশতাকে খণ্ডতে পারেননি।

সে কারণেই সম্ভবত স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের প্রথম দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতি রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে নির্বাসিত এবং অধিকতর ডানপন্থীর ইসলামঘেঁষা রাজনীতি ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে আসার পরও বাঙালিত্বের উদ্‌যাপন ফিকে হয়ে যায়নি; বরং নতুন রাজনৈতিক বিন্যাসে নতুন ইসলামপন্থা এবং এমনকি একাত্তরবিরোধী রাজনৈতিক শক্তির পুনর্বাসনের সময়েও বাঙালিত্বের উদ্‌যাপন আরও জোরেশোরে হয়েছে, যা খানিকটা পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্রচর্চার উদ্যোগের সঙ্গেই তুলনীয়।

কিন্তু এই উদ্‌যাপন প্রশ্নের মুখে পড়ল বুদ্ধিবৃত্তিক কিংবা সাংস্কৃতিক কারণে যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক কারণে। ২০০৮ সালে রাষ্ট্রক্ষমতায় ফিরে আসার পরে, দেড় দশকের বেশি সময় ধরে একের পর এক ভোটারবিহীন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারীরা মুখে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' জপেছেন, ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধের বিচারকে প্রহসনে পরিণত করে রাজনৈতিক ভিন্নমতকে দমন করতে চেয়েছেন। তাঁদের সীমাহীন দমন-পীড়ন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ক্রমে মানুষের ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে, যা এ বর্ষায় স্বৈরশাসনের বাঁধ ভেঙে সারা দেশকে প্লাবিত করে।

এই সময়ে পুরোনো বাঙালিত্বের স্মারকগুলোকে ছাপিয়ে প্রতিবাদের মাঠে ভিন্ন পরিচয়ের স্মারক মূর্ত হয়ে উঠতে থাকে। 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা'র যে হেজেমনিক বয়ান দুর্নীতিগ্রস্ত শাসকেরা তৈরি করেছিলেন, মানুষ সেই প্রহসনকে প্রত্যাখ্যান করে। এই অভ্যুত্থান একই সঙ্গে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারীদের যেমন শাসনক্ষমতা থেকে চ্যুত করে, তেমনই তাঁদের নেপথ্যের শক্তি হিসেবে প্রতিবেশী দেশ ভারতকে শনাক্ত করে। ভারত বিগত শাসনামলে এই দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিসরে যে না-হক কর্তৃত্ব ফলিয়েছে, তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উচ্চারিত হয়। একই সঙ্গে প্রত্যাখ্যাত হয় ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে অবদানের কারণে ভারতের কাছে 'চিরঋণী' থাকার বয়ান। বাংলাদেশের জনমানসে ভারত এই নৈতিক কর্তৃত্ব হারানোর সঙ্গে সঙ্গে অভিন্ন বাঙালিত্বের প্রকল্পও অচল হয়ে পড়ে।

এমন এক পরিপ্রেক্ষিতে এই দেশে জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে পুনর্ভাবনা জরুরি। মনে রাখতে হবে, দক্ষিণ এশীয় অপরাপর সমাজের মতো বাংলাদেশেও ধর্ম এক গুরুত্বপূর্ণ গাঠনিক উপাদান। এ কথা মানতে হবে, এই সমাজের সিংহভাগ মানুষ ধর্মবিশ্বাসী এবং যেকোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাতে করে এই সরল উপসংহারে উপনীত হওয়া সংগত হবে না যে ধর্ম ও ভাষিক জাতিসত্তার দুই স্মারক—বাঙালি ও মুসলমান এ দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ বর্গকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারলেই বাংলাদেশে একটি আদর্শ জাতীয়তাবাদী রাজনীতি দাঁড় করানো যাবে।

জাতীয়তাবাদ তথা যেকোনো পরিচিতিনির্ভর রাজনীতির একটা সংকট হলো পরিচয় গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াটাই একাধারে গ্রহণ ও বর্জনমূলক। যেমন বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাঙালি নয়, কিংবা তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক—এমন সব পরিচয় ও বর্গকে পর করে, তা সে মুসলমান, বিহারি, চাকমা, যা-ই হোক না কেন। একইভাবে ইসলামি পরিচয়বাহী রাজনীতি, যা কিছুকে ইসলামবিরোধী জ্ঞান করে, তাকেই বর্জন করবে। এখন সেই সূত্রমতে বাঙালি-মুসলমানের জাতীয়তাবাদ কায়েম হওয়ার অর্থ হলো, এ দেশে যেসব মানুষ একই সঙ্গে এ দুই বর্গের নন, তাঁরা সবাই এখানে জাতীয়তাবাদের পরিসরে 'অপর' হয়ে উঠবেন। জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে এই অপরকরণ থেকে মুক্তির কোনো পথ নেই। ইউরোপের জাতিরাষ্ট্রগুলো এই অপরকরণের সংকটে পড়েছিল, যখন কিনা সাবেক উপনিবেশগুলো থেকে সেখানে অভিবাসীরা পাড়ি জমিয়েছিলেন। আজ অবধি বহু-সাংস্কৃতিক রাষ্ট্র তৈরি করেও সাংঘর্ষিক পরিচয়ের রাজনীতির বিবাদ থেকে তারা মুক্তি পায়নি।

তাহলে উপায় কী? জাতীয়তাবাদী পরিচয়ের রাজনীতিকে আমরা ফেলে দিতে পারব না, কিন্তু আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, তাকে যথাসম্ভব অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলা। সাম্প্রতিক সময়ে এই কথা জোরেশোরে উঠেছে যে বিগত সেক্যুলার ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী শাসনে হিজাব পরা নিয়ে, মাদ্রাসায় লেখাপড়া করা নিয়ে মানুষকে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। আবার ঠিক এ মুহূর্তে সেক্যুলার মহলে এই শঙ্কা বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে যে ইসলামপন্থী রাজনীতি শক্তিশালী হলে অপরাপর ধর্মের কিংবা ধর্ম মানেন না, এমন মানুষের জীবন ও বিশ্বাস আক্রান্ত হবে কি না; অথবা ইসলাম অনুমোদন করে না—এমন পোশাক নারীরা পরতে পারবে কি না। আবার ধরুন, আদিবাসী মানুষ, যাঁরা না বাঙালি না মুসলমান, তাঁরা তো দুই খাঁড়ারই নিচে কাটা পড়বেন।

কিন্তু দেশটা যতটুকু বাঙালির, ঠিক ততটুকুই ভিন্ন জাতির মানুষেরও; যতটা মুসলমানের, ঠিক ততটাই অপরাপর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মানুষেরও; যতটা পুরুষের, ঠিক ততটাই নারীর কিংবা নারী কিংবা পুরুষ নন, এমন ভিন্ন লিঙ্গের মানুষেরও। রক্তস্নাত গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী বাংলাদেশকে আমরা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের ঊর্ধ্বে উঠে যদি কল্পনা করতে না পারি, তাহলে তো আবার আমাদের সংঘর্ষের চোরা পথেই ঘুরে মরতে হবে।

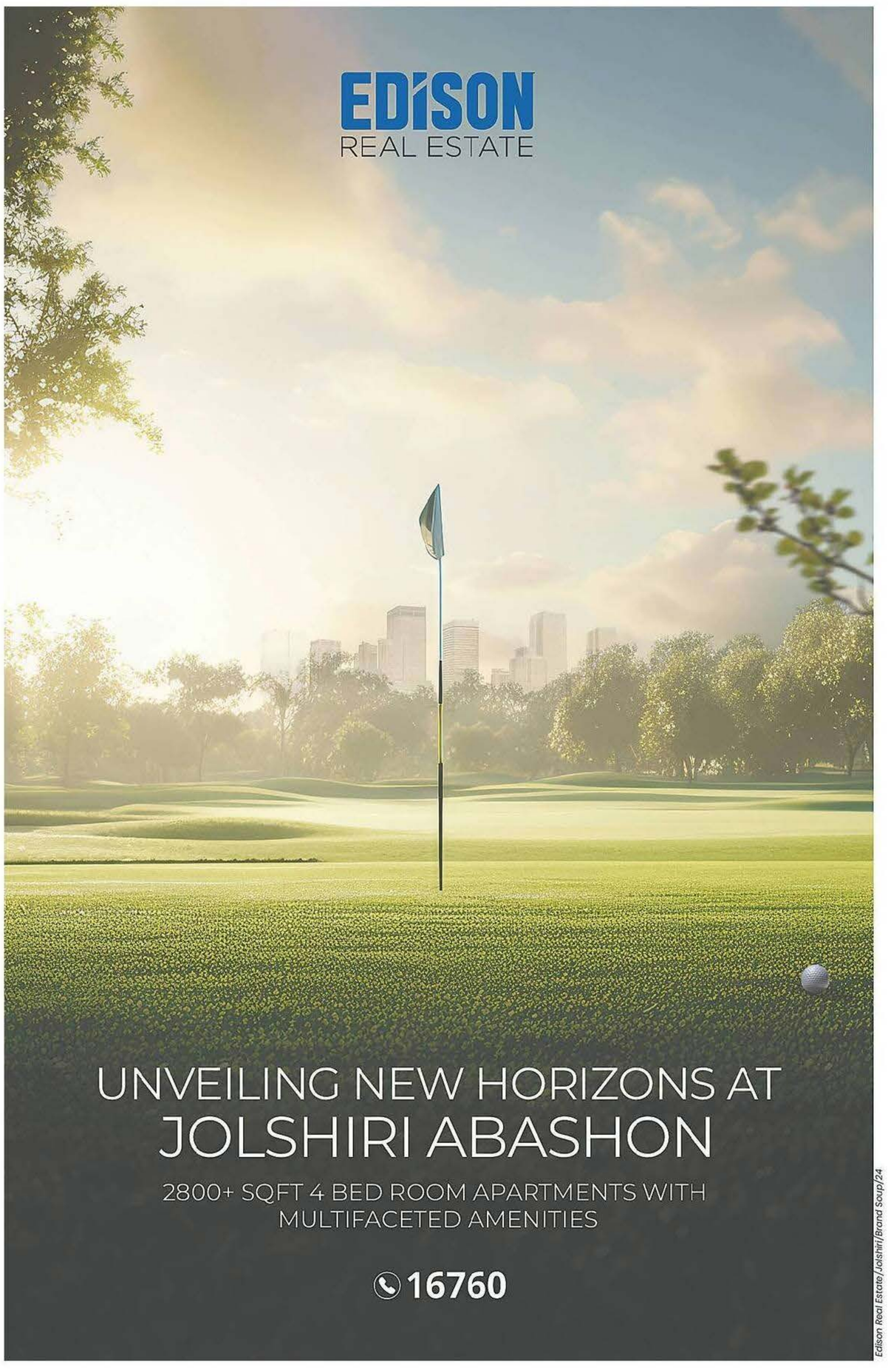

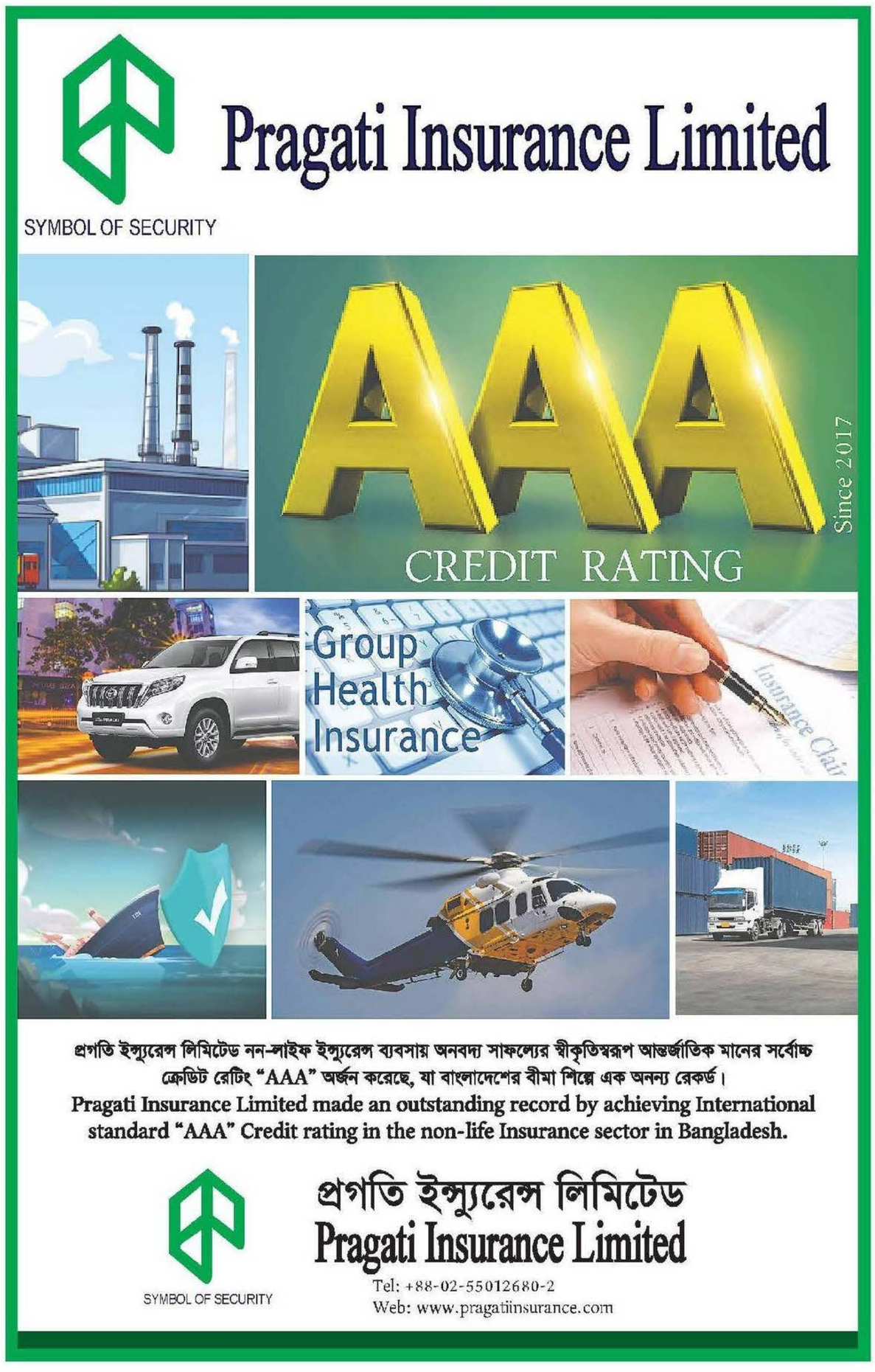

বৈদেশিক নীতির সংস্কার জরুরি

সাহাব এনাম খান

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক

পররাষ্ট্র

বাংলাদেশ এখন তার ইতিহাসের এক ক্রান্তিলগ্নে দাঁড়িয়ে আছে। আধা স্বৈরাচারী শাসন থেকে প্রত্যাশিত এক কার্যকর গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হওয়ার পথে সে পা রেখেছে। সাম্প্রতিক গণ-অভ্যুত্থান এবং হাজার মানুষের, ব্যক্তির সর্বোচ্চ ত্যাগের ফলে আওয়ামী লীগের ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটেছে। এই পরিবর্তন অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে একটি অন্তর্বর্তী সরকার। ১৫ বছরের শাসক আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে কী দ্রুততার সঙ্গে নামিয়ে দিয়েছে জনগণ, তা বিশ্ব দেখেছে। এই কাজ ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। তা সত্ত্বেও তরুণ প্রজন্ম এবং বৃহত্তর জনসাধারণের আবেগ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ এই রূপান্তরকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

জনগণ বাংলাদেশকে দেশে ও বিশ্বে একটি আত্মবিশ্বাসী জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে সে আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। ড. ইউনূসের নেতৃত্ব গ্রহণ বাংলাদেশকে নিয়ে বিশ্বব্যাপী আগ্রহ ও উদ্দীপনাকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। বহুপক্ষীয় সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বিশেষ করে পশ্চিমা ব্লক থেকে যথেষ্ট সমর্থন পাওয়া গেছে। আর চীন ও প্রাচ্যের উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক শক্তি, যেমন মালয়েশিয়া, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া থেকে বাংলাদেশের সংস্কার উদ্যোগ নিয়ে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে। এখন জনগণ সেই সম্ভাবনাগুলো বাস্তবে দেখতে চায়।

বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। সবাই তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য হলো একটি সুষ্ঠু নির্বাচনপ্রক্রিয়া নিশ্চিত করা। ড. ইউনূসের প্রশাসনকে অবশ্যই নির্বাচনী সংস্কার বাস্তবায়ন করতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য বিশ্বব্যাপী সমর্থন। দেশের পররাষ্ট্রনীতির যা প্রয়োজন, তা হচ্ছে সংস্কার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদের পরও ব্যাপক সংস্কার এবং বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা।

এটা বোঝা দরকার যে পররাষ্ট্রনীতি আর শুধু উচ্চ স্তরের রাজনীতির বিষয় নয়। উন্নত প্রযুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তা এখন জনসাধারণের যাচাইয়ের বিষয় হয়ে উঠেছে। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট আন্দোলনের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও ভারতের প্রতি বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণের উপলব্ধি হয়ে উঠেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক। আন্দোলন আমাদের বৈদেশিক নীতিতে একটি আমূল পরিবর্তনের পক্ষে জোর দিয়েছে। এই আন্দোলন একটি সক্রিয় বৈদেশিক নীতির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছে। এই নীতি হতে হবে এক গঠনমূলক বয়ান, যা রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতানির্বিশেষে আমাদের জাতীয় স্বার্থ ও জাতীয় ঐকমত্যকে প্রতিফলিত করবে।

> যেসব সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে পররাষ্ট্রনীতিও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। সেই পররাষ্ট্রনীতির কেন্দ্রে থাকবে চারটি প্রধান বিষয়। প্রথমত, দুই প্রধান শক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও চীন স্বাভাবিকভাবেই ভূরাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করবে।

পররাষ্ট্রনীতিতে কী সংস্কার করা উচিত

মূল সংস্কার নিহিত থাকা উচিত বয়ানের মধ্যে। বাংলাদেশ সমর্থন করে বহুপক্ষীয় ও নিবেদিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। তবে এটুকুই যথেষ্ট নয়। দেশের সংবিধানের ২৫তম অনুচ্ছেদ রাজনৈতিক, জাতিগত, ধর্মীয় বা জাতিগত সম্পর্কনির্বিশেষে নিপীড়িত

মিয়ানমারের সঙ্গে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান করতে হবে বাস্তবসম্মতভাবে। ছবি : প্রথম আলো

জনগোষ্ঠীর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছে। আমাদের বৈদেশিক নীতির বয়ানগুলো অবশ্যই বিশ্বব্যাপী মানবিক বিষয়ের পক্ষ অবলম্বন করবে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। এ জন্য জাতীয় সার্বভৌমত্বকে স্পষ্টভাবে হাজির করা দরকার, যেন অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ে বাইরের পক্ষের প্রভাবের ওপর সীমা টেনে দেওয়া যায়। তবে একটি ব্যাপারে সতর্কতাও জরুরি। দেশে ভালো সরকার থাকলেই কেবল এই বয়ান জোরদার হবে।

যেসব সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে পররাষ্ট্রনীতিও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। সেই পররাষ্ট্রনীতির কেন্দ্রে থাকবে চারটি প্রধান বিষয়। প্রথমত, দুই প্রধান শক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও চীন স্বাভাবিকভাবেই ভূরাজনৈতিক ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করবে। অতএব, বাংলাদেশের কৌশল হওয়া উচিত বাণিজ্যিক উদারতাবাদের ওপর ভিত্তি করে সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রেখে জাতীয় স্বার্থকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া। বঙ্গোপসাগর হচ্ছে ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মাঝখানের সমুদ্র। তাই সন্দেহ নেই যে বাংলাদেশকে চলমান ভূকৌশলগত জটিলতার মুখোমুখি হতে হবে।

দ্বিতীয়ত, দ্বিপক্ষীয় সংযুক্তির ক্ষেত্রে ম্যাকিয়াভেলিয়ান বাস্তববাদকে কেন্দ্রে রাখা প্রয়োজন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি বহুপক্ষীয়তাকে আদর্শবাদ থেকে বাস্তববাদে রূপান্তরিত করতে হবে। আর তা করতে হবে বৈশ্বিক মানবতাবাদ এবং অভ্যন্তরীণ মানব নিরাপত্তা স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে। একে হতে হবে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার ওপর নির্মিত। সুষ্ঠু ও ন্যায়সংগত আন্তর্জাতিক বিষয়ের পক্ষে দাঁড়ানো এবং আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করা হবে এর প্রেরণা। বাংলাদেশ যে দেশগুলোর সঙ্গে সীমান্ত ভাগ করে, তাদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হবে না।

তৃতীয়ত, আমাদের ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও প্রসারিত করতে হবে। বাস্তবসম্মতভাবে সমাধান করতে হবে মিয়ানমারের সঙ্গে সমস্যাগুলো। জাপান, কোরিয়া ও দক্ষিণ-পূর্বের দেশগুলো বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং সংযোগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, রাখাইন অংশীজন, রোহিঙ্গা এবং মিয়ানমারের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টজনদের সহযোগিতায় মিয়ানমারকে স্থিতিশীল করার জন্য স্পষ্ট বৈদেশিক ও সমন্বিত কৌশলগত নীতি তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের ১৯৭৮-৭৯ এবং ১৯৯১-৯২ সালে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের সফল ইতিহাস রয়েছে। তাই বাংলাদেশকে তৃতীয় দেশের স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে জাতীয় কৌশলগত বিবেচনার ভিত্তিতে মিয়ানমার নীতি তৈরি ও প্রয়োগ করতে হবে।

ভারতের ওপর প্রাথমিক ফোকাস রেখে বাংলাদেশকে একটি বিস্তৃত দক্ষিণ এশিয়া নীতি প্রণয়ন করতে হবে। রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা উদ্বেগকে খুব বেশি গুরুত্ব না দিয়ে ভারতের প্রতি বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত স্বচ্ছ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ নীতি এবং আন্তর্জাতিক আইন ও নিয়মের ভিত্তিতে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চল আর বঙ্গোপসাগর-সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বাহ্যিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সংখ্যালঘু সমস্যা, এমনকি এর অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই বাংলাদেশের ওপর ভারতীয় অস্থিতিশীলতার সম্ভাব্য প্রভাবের দিকে নজর দিতে হবে। জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য তাদের বিদেশ নীতিতে ভারতের সব পক্ষ দৃঢ়ভাবে এক পক্ষ থাকে। সে জায়গায় তাদের সংবাদমাধ্যমও ঐক্যবদ্ধ। বলতে দ্বিধা নেই যে তাদের এই অবস্থান থেকে আমাদের রাজনীতিবিদদের অনেক কিছু শেখার আছে।

যাত্রা কোন দিকে

জুলাই-আগস্ট আন্দোলনকে ঘিরে জনসাধারণের মনোভাব বিবেচনা করে বাংলাদেশকে তার বৈদেশিক নীতির দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে। একটি আত্মবিশ্বাসী জাতির চেতনা মূর্ত করার জন্য দেশের এমন কূটনীতিক, প্রতিরক্ষাকৌশলবিদ এবং রাজনীতিবিদদের প্রয়োজন, যাঁরা যোগ্য, সাহসী ও উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি আজ সমাজকে পুনর্নির্মাণ করছে। কূটনীতিও এর ব্যতিক্রম নয়। সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক বা ভাষার গিথক্রিয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে সুরক্ষার গ্যারান্টি দিতে পারে না। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী, ইউক্রেন বা ফিলিস্তিন হলো এর ক্ল্যাসিক উদাহরণ।

বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী, জনতাত্ত্বিক বিভাগ, সম্পদকে ঘিরে গড়ে ওঠা জাতীয়তাবাদ, বাণিজ্য সুরক্ষাবাদ, শক্তি সরবরাহ লাইন, প্রযুক্তি বৈষম্য, রাজনৈতিক জনতুষ্টিবাদ, শ্রম অভিবাসন, ভুল তথ্য, বিভ্রান্তিমূলক তথ্য, জলবায়ু, জল এবং স্বাস্থ্য সংকটের মতো বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য সমস্যা হিসেবে হাজির হতেই থাকবে। বিশ্বজুড়ে ধর্মীয় উগ্র ডানপন্থী বয়ান ক্রমেই জোরদার হতে দেখা যাচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে বৈদেশিক নীতিকে ধর্মতত্ত্ব দিয়ে চালিত হওয়ার পরিবর্তে ব্যয় আর বিনিময়ে পাওয়া সুবিধা দিয়ে মাপ হবে।

সব মিলিয়ে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে বর্তমানে কাজ করা অতীতের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন রকম। জ্যেষ্ঠ কূটনীতিকদের সঙ্গে আমার কথোপকথন হয়েছিল। সেসব থেকে আমার মনে হয়েছে, আমাদের পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আমাদের সিদ্ধান্তে কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন অর্জনের চেষ্টা করা। পররাষ্ট্রনীতির সমন্বয় সাধন এখনো একটি উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ। সমন্বয়হীনতা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে কয়েক দশক ধরে সমস্যায় ফেলেছে। এ ছাড়া বৈদেশিক নীতির জবাবদিহি আরও স্পষ্ট হওয়া দরকার। সাংবিধানিক অনুচ্ছেদ ১৪৫ ও ১৪৫ক এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। কিন্তু এর আলোচনা হতে দেখা যায় না।

সামনের বছরগুলোতে বৈদেশিক নীতির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির জন্য একটি শক্তিশালী জাতীয় ঐকমত্য অপরিহার্য হবে। মনে রাখা দরকার যে বৈদেশিক নীতির প্রাথমিক চ্যালেঞ্জগুলো জন্ম নেয় রাজনৈতিক বিভাজন থেকে। হেনরি কিসিঞ্জার একবার পরিহাস করে বলেছিলেন, 'পররাষ্ট্রনীতি অনেক চৌকস হয়ে লাভ নেই, যদি তা অল্প কিছু লোকের মনে জন্ম নিয়ে কারও হৃদয়ে স্থান না পায়।' কথাটা মনে রাখা দরকার।

মূল ইংরেজি থেকে অনূদিত

সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রেক্ষাপট, কারণ ও ভবিষ্যতের পথযাত্রা

সাইমুম পারভেজ

ডয়চে ভেলে একাডেমির রাজনৈতিক যোগাযোগবিষয়ক প্রভাষক

সংখ্যালঘু

গত ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের মুখে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর দেশে যে অস্থিরতা তৈরি হয়, তার মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। ঘটনা ও প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সব হামলাকে সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় বিবেচনায় হামলা বলে চিহ্নিত করা কঠিন। রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণেও হামলা হয়েছে। জনরোষ ও ব্যক্তিগত আক্রোশের শিকারও হয়েছেন অনেকে। যাঁদের ঘরবাড়ি, দোকানপাটে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে, তাঁদের মধ্যে যেমন সংখ্যালঘুরা রয়েছেন, তেমনি সাবেক শাসক দল আওয়ামী লীগের সংখ্যাগুরু মুসলমান নেতা-কর্মীরাও রয়েছেন। গত ১২ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত *প্রথম আলোর* একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৫ থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত হামলার শিকার সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১ হাজার ৬৮। এর মধ্যে কমপক্ষে ৫০৬টি স্থাপনার মালিক আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। প্রতিবেদনে দুজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়।

এর আগে বড় ধরনের হামলার ঘটনা ঘটে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০২১ সালে দুর্গাপূজার সময়। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সে বছর দেশের ২৭টি জেলায় হামলায় ১১৭টি মন্দির-পূজামণ্ডপ ভাঙচুর করা হয়। ৩০১টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও বসতবাড়িতে হামলা হয়। গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে নিহতের চেয়ে ২০২১ সালে নিহতের সংখ্যা বেশি ছিল, ৯ জন।

বাংলাদেশে জাতি ও ধর্মের বিবেচনায় হওয়া হামলার ঘটনাগুলোর সঠিক বিশ্লেষণ করতে হলে শুধু ৫ আগস্টের পরবর্তী ঘটনার দিকে তাকালে হবে না; বরং এ ধরনের হামলা কেন হয়, এসব হামলায় কারা লাভবান হয় এবং ভবিষ্যতে এসব হামলা কমানোর উপায় কী, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা দরকার। সাম্প্রতিক গণ-অভ্যুত্থান আমাদের সামনে একটি সুযোগ এনে দিয়েছে রাষ্ট্রকাঠামো ও শাসনব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে চিন্তা করতে এবং আমাদের সমাজের মধ্যে জাতীয়-ধর্মীয় পরিচয়গত ফাটলগুলো মেরামত করতে। তাই ৫ আগস্ট-পরবর্তী সংখ্যালঘুদের ওপর হামলাকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে এর রাজনৈতিক, সামাজিক ও কৌশলগত কারণ ও প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ জরুরি। কর্তৃত্ববাদী শেখ হাসিনা সরকারের বশংবদ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও দলীয় অস্ত্রধারী সদস্যদের নির্বিচার গুলি ও হামলায় আহত ও নিহত হাজারো মানুষের ত্যাগ ও তিতিক্ষাদের সামনে রেখে সাম্য ও বৈষম্যহীন সমাজব্যবস্থা গঠনের লক্ষ্যে এসব ঘটনার স্বরূপ ও প্রকৃতি বোঝাপড়া দরকার।

ধর্ম ও জাতিগত সন্ত্রাস ও দাঙ্গা কেন হয়, তা নিয়ে বাংলাদেশে একাডেমিক গবেষণা কম। বৈশ্বিক পরিসরে ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও নাইজেরিয়ার মাঠপর্যায়ে চালানো গবেষণা রয়েছে। এসব গবেষণায় এ ধরনের হামলার পেছনে 'ইনস্ট্রুমেন্টাল' কারণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। অর্থাৎ কোনো শক্তি (যেমন রাজনৈতিক দল বা কোনো ক্ষমতাশালী নেতা) এ ধরনের হামলাকে ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করে ফায়দা লোটে বা সুপরিকল্পিতভাবে কোনো লাভের জন্য দাঙ্গা ও হামলাকে উৎসাহিত করে।

পল ব্রাসের (২০০৫) গবেষণায় দেখা যায়, ভারতের উগ্রপন্থী সংগঠনগুলো হিন্দু-মুসলমান বিভেদ জিইয়ে রাখতে 'প্রাতিষ্ঠানিক দাঙ্গা ব্যবস্থা' চালু রাখে।

> বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা কেন হয়, তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হলেও এর ফলে কে লাভবান হয় এবং কী প্রক্রিয়ায় তা প্রতিরোধ করা যায়, তা নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ লক্ষ করা যায় না।

জাতি-ধর্ম পরিচয়ভিত্তিক সহিংসতা কমাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিকল্প নেই। ১৩ অক্টোবর ২০২৪। ছবি : প্রথম আলো

বিশেষ করে নির্বাচনের আগে এ ধরনের ধর্মীয় বিভেদ তৈরি করার প্রবণতা দেখা যায় বলে জানান স্টিভেন উইলকিনসন (২০০৪)। নাইজেরিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় চালানো গবেষণায় ইয়ানা ক্রাউস (২০১৮) ও ওয়ার্ড বেরেনশট (২০২০) দেখেন যে বিশেষ করে যুবকদের জাতিগত ও ধর্মীয় বিভেদগত 'সন্ত্রাস ও দাঙ্গা' তৈরি করতে সহজে ব্যবহার করেন রাজনৈতিক নেতারা। এ ধরনের জাতি-ধর্মের পরিচয়ের বিভেদ উগ্রপন্থী ও তীব্র জাতীয়তাবাদী দলগুলোর জনসমর্থন বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ২০২২ সালে প্রকাশিত জায়নেপ বুলুটগিল ও নিরাজ প্রসাদের গবেষণায় অর্থনৈতিক বৈষম্যের সঙ্গে জাতি-ধর্মগত দাঙ্গা-হামলার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়। তাদের গবেষণা অনুযায়ী যখন সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু উভয়ই অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয় এবং একই মাত্রায় বৈষম্যের শিকার হয়, তখন তারা তাদের অর্থনৈতিক ইস্যুগুলোর দিকেই বেশি নজর দেয়, নিজেদের ধর্মীয় বা জাতিগত পার্থক্য নয়। এমন সময় রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রভাবশালী অশুভ শক্তিগুলো তাদের মধ্যে জাতিগত দাঙ্গা তৈরি করে ধর্মীয় বা জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে বিভেদ ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা কেন হয়, তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হলেও এর ফলে কে লাভবান হয় এবং কী প্রক্রিয়ায় তা প্রতিরোধ করা যায়, তা নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ লক্ষ করা যায় না। গত কয়েক দশকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান এবং পাহাড়ে ও সমতলের জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপরে নানাবিধ হামলা লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে বৃহৎ প্রতিবেশী দেশ ভারত হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার কারণে হিন্দুদের ওপর হামলার প্রভাব দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও পড়ে। বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর হামলা এবং ভারতে মুসলমানদের ওপর হামলা উভয় দেশের রাজনীতির অন্যতম আলোচনার বিষয়। জনসমর্থন ও ভোটের রাজনীতিতে রয়েছে এর প্রভাব।

ওপরের আলোচনায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার যেসব কারণের কথা বলা হয়েছে, তা বাংলাদেশেও লক্ষ করা যায়। রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়া, যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর কাছে জনসমর্থন বাড়াতে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বলা, সংখ্যালঘুদের 'রক্ষাকারী' সেজে ভোটব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করা ইত্যাদি বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রবণতা। এ ছাড়া জমি, দোকান ও অন্যান্য সম্পত্তির দখল নেওয়ার জন্য হিন্দুধর্মাবলম্বীদের ওপর হামলা এবং হামলার প্রেক্ষাপট তৈরির উদাহরণও রয়েছে। ২০১২ সালে রামুতে বৌদ্ধবিহারে হামলা ও ২০১৬ সালে নাসিরনগরের ঘটনায় দেখা যায়, তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী রাজনৈতিক দলের নেতাদের ইন্ধন ও যোগসাজশ ছিল এসব হামলায়। মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী ২০১৩ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত হিন্দুদের ওপর কমপক্ষে ৩ হাজার ৬৭৯টি হামলার ঘটনা ঘটে।

৫ আগস্টের পর রাজনৈতিক ফায়দা লাভের উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন মিডিয়া ও বিভিন্ন ব্যক্তির সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হিন্দুদের বাড়িঘর-মন্দিরে হামলার ঘটনাগুলোকে অতিরঞ্জিত করে প্রচার করা হয়। পুরোনো ঘটনাকে নতুন বলে প্রচার করে, অন্য দেশের বা অন্য ঘটনার অপ্রাসঙ্গিক ভিডিও ও ছবি ব্যবহার করে ভুয়া ও অপতথ্য চালানো হয়। ডয়চে ভেলে (ইংরেজি সংস্করণ, ৭ আগস্ট ২০২৪), বাংলা আউটলুক (ইংরেজি ও বাংলা সংস্করণ, ৮ আগস্ট ২০২৪), বিবিসি (বাংলা সংস্করণ, ১১ আগস্ট ২০২৪) ও আল-জাজিরার (ইংরেজি, ৮ আগস্ট ২০২৪) অনুসন্ধানে দেখা যায়, মন্দিরে, দোকানপাটে হামলা, নারী নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ ও হত্যার অসংখ্য মিথ্যা দাবি ও ভুয়া তথ্য প্রচার করা হয়। এসব বিভ্রান্তিকর প্রচারণায় একদিকে যেমন প্রকৃত ঘটনাগুলোর সত্যতাকে প্রশ্নের মুখোমুখি করে, তেমনি আন্তর্জাতিক সমাজের কাছে ভুল বার্তা গিয়ে বাংলাদেশের গণ-অভ্যুত্থানের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে। এক পক্ষ দাবি করে, সংখ্যালঘুদের ওপর কোনো ধরনের হামলাই হয়নি, অন্য পক্ষ শত শত হিন্দু হত্যার ভুয়া দাবি সামনে নিয়ে আসে। এই দুই পক্ষের দাবিই বাংলাদেশের সহনশীল ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিপরীত মত এবং তারা 'অস্বীকারের রাজনীতি' ধারণ করে।

স্বৈরাচারবিরোধী গণ-অভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছেন এবং প্রাণ দিয়েছেন সংখ্যালঘুরাও। ছয় বছরের ছোট্ট রিয়া গোপ বাড়ির ছাদে হেলিকপ্টার থেকে ছোড়া গুলিতে নিহত হয়। শনির আখড়ায় পুলিশের গুলিতে নিহত হন দুই শিশুসন্তানের জনক ৪০ বছর বয়সী সৈকত চন্দ্র দে। ৪ আগস্ট হবিগঞ্জে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আন্দোলনে নেমে প্রাণ দেন রিপন চন্দ্র শীল। রেখে যান আড়াই মাসের সন্তান। কমপক্ষে নয়জন হিন্দুধর্মাবলম্বী গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ হন (সমকাল, ১৩ অক্টোবর ২০২৪)। এই আত্মত্যাগ আমাদের নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখায়, যার ভিত্তি অসাম্প্রদায়িকতা।

জাতি-ধর্ম পরিচয়ভিত্তিক সহিংসতা কমাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। আর এ ধরনের সম্প্রীতি বাড়াতে সামাজিক প্রকল্প নিতে হবে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে। ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত আশুতোষ ভার্শের একটি গবেষণায় দেখা যায়, নাগরিক সংগঠনগুলো ট্রাস্ট নেটওয়ার্ক বা 'বিশ্বাস সংযোগ' তৈরি করার মাধ্যমে এ ধরনের সাম্প্রদায়িক সহিংসতার তীব্রতা কমাতে সক্ষম। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোকেও পরিষ্কারভাবে অসাম্প্রদায়িক ও বহুত্ববাদ প্রতিষ্ঠার কথা বলতে হবে ও সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। যে নতুন বাংলাদেশ গড়ার জন্য হাজারো মানুষ প্রাণ দিলেন, গুরুতর আহত হলেন এবং দৃষ্টিশক্তি হারালেন, তা সফল হবে তখনই যখন সব ধরনের বিশ্বাস ও মতের মানুষের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত হবে।

ENVOY TEXTILES LIMITED

- **WORLD'S FIRST LEED CERTIFIED PLATINUM DENIM MILL**
- **FIRST ROPE-DYEING TECHNOLOGY** IN BANGLADESH
- **FIRST ECO LAB** IN BANGLADESH IN STRATEGIC PARTNERSHIP WITH **JEANOLOGIA**
- **11**-TIME WINNER OF **NATIONAL EXPORT TROPHY**
- WINNER OF **NATIONAL ENVIRONMENTAL AWARD**
- **3**-TIME WINNER OF **PRESIDENT'S INDUSTRIAL DEVELOPMENT AWARD**
- MULTIPLE-TIME WINNER OF **HIGHEST TAXPAYER AWARD**
- **2**-TIME WINNER OF **HSBC EXPORT EXCELLENCE AWARD**
- **LAB ACCREDITATION** BY RENOWNED BRANDS LIKE **LEVI'S, KONTOOR, AMERICAN EAGLE, J.CREW, VF, RALPH LAUREN, TARGET,** etc.

amfori BSCI Trade with purpose
amfori BEPI Trade with purpose
ISO 9001 ISOQAR REGISTERED ISOQAR UKAS QUALITY MANAGEMENT 0026
ISO 14001 ISOQAR REGISTERED ISOQAR UKAS QUALITY MANAGEMENT 0026
SUSTAINABLE APPAREL COALITION Higg Facility Social & Labor Module VERIFIED MODULE
SUSTAINABLE APPAREL COALITION Higg Facility Environmental Module VERIFIED MODULE
OEKO TEX® STANDARD 100
ROADMAP TO ZERO
GOTS - Global Organic Testing Standard
GRS - Global Recycled Standard
OCS - Organic Content Standard
RCS - Recycled Claim Standard
SOCIAL & LABOR CONVERGENCE
investing in better cotton BetterCotton.org/MassBalance
COTTON USA™ THE COTTON THE WORLD TRUSTS
COTTON MADE IN AFRICA

EXPORTING WORLDWIDE

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS · Levi's · KONTOOR · INDITEX · UNIQLO · target
BESTSELLER · H&M · J.CREW · C&A · Calvin Klein · COTTON:ON
Walmart · vf · TESCO · GAP · Carrefour · s.Oliver
LC WAIKIKI · JCPenney · next · Kmart · RALPH LAUREN · UNITED COLORS OF BENETTON.

www.envoytextiles.com

উন্নয়নের দ্রুতগতির জন্য শক্তিশালী স্থানীয় সরকার

দিলীপ কুমার সরকার

সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী

স্থানীয় সরকার

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্বাচন ছিল নির্দলীয়। ২০১৫ সালে আইনে পরিবর্তন এনে রাজনৈতিক দলভিত্তিক নির্বাচনের বিধান করা হয়। এতে বিরাজমান দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির নেতিবাচক প্রভাব যেমন গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর জন-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী দেশ এখন সংস্কারের পথে যাত্রা শুরু করেছে। অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত নির্বাচনব্যবস্থা, সংবিধান, জনপ্রশাসন, বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন ও পুলিশ প্রশাসন সংস্কার কমিশন এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছে। দেশের অগ্রগতির জন্য স্থানীয় সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলেও প্রথম দিকে এ বিষয়ে সংস্কারের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। তবে আশার কথা, গত ৩১ অক্টোবর অন্তর্বর্তী সরকার একজন উপদেষ্টা স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন গঠনেরও ঘোষণা দিয়েছেন। এ জন্য সরকারকে ধন্যবাদ। কেননা, আমরা যদি উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে চাই, তবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করার কোনো বিকল্প নেই।

আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল সংবিধানে কার্যকর ও স্বশাসিত স্থানীয় সরকারব্যবস্থা গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদে প্রশাসনের প্রতিটি স্তরের সার্বিক কর্মকাণ্ড জনপ্রতিনিধিদের নেতৃত্বে পরিচালনাসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর প্রশাসনিক কার্যক্রম, জনশৃঙ্খলা রক্ষা, জনসেবা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, কর আরোপ এবং বাজেট প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু সাংবিধানিক আকাঙ্ক্ষার আলোকে আমাদের দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের আইনসমূহ প্রণীত না হওয়ায় শক্তিশালী স্থানীয় সরকারব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি।

শাসনব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের অন্যতম নীতি হলো 'যেখানে সমস্যা, সেখানেই সমাধান'। তা সম্ভব না হলে তার ওপরের স্তরে যাওয়া। এভাবেই সীমিতসংখ্যক সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর ন্যস্ত করা। কেননা, রাষ্ট্রের সব সমস্যা কেন্দ্রীয় সরকারের একার পক্ষে সমাধান করা সম্ভব নয়। বিকেন্দ্রীকরণের এই নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজন ক্ষমতা, দায়িত্ব ও সম্পদে শক্তিশালী করাসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে গণতান্ত্রিক ও জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা; যা আজও কার্যকর হয়নি। ফলে নানা সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়েই আমাদের দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

আইনগতভাবে প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণপ্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক হওয়ার কথা থাকলেও প্রতিষ্ঠানগুলো অনেকাংশেই মেয়র বা চেয়ারম্যাননির্ভর। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায়, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন হয় পদভিত্তিক। ভোটাররা ভোট দিয়ে মেয়র, চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর বা সদস্য নির্বাচিত করেন। ফলে

স্থানীয় সরকার সংস্কারের জন্য নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারও প্রয়োজন। ছবি : প্রথম আলো

জনপ্রতিনিধিদের আচরণেও ঊর্ধ্বতন ও অধস্তনের দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময়েও অপেক্ষাকৃত প্রভাবশালীরা মেয়র বা চেয়ারম্যান পদে এবং অপেক্ষাকৃত দুর্বলেরা কাউন্সিলর বা মেম্বার পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণের উপায় স্থানীয় সরকারে সংসদীয় পদ্ধতির নির্বাচনব্যবস্থা প্রবর্তন। অর্থাৎ প্রথমে সবাই কাউন্সিলর বা মেম্বার হবেন এবং পরে নির্বাচিতরা বসে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মেয়র বা চেয়ারম্যান নির্বাচন করবেন। এই পদ্ধতির নির্বাচন একদিকে যেমন প্রার্থীদের গুণগত মান উন্নত করবে, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানগুলোতে গণতন্ত্র চর্চার দ্বার উন্মুক্ত করবে। কেননা তখন মেয়র বা চেয়ারম্যান হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদেরও কাউন্সিলর বা সদস্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। এ ছাড়া জেলা পরিষদ নির্বাচন 'সৌলিক' গণতন্ত্রের আদলে না করে সাধারণ ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে আয়োজন করতে হবে।

বর্তমানে নারীদের জন্য যে ধরনের আসন সংরক্ষণের পদ্ধতি রয়েছে, তাতে একই এলাকায় সাধারণ আসনের কাউন্সিলর বা সদস্যদের সঙ্গে সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর বা সদস্যদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে দ্বৈততা সৃষ্টি হয়। এই পদ্ধতি পরিবর্তন করে ঘূর্ণমান পদ্ধতিতে আসন সংরক্ষণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মোট ওয়ার্ডের এক-তৃতীয়াংশ নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং ওই ওয়ার্ডগুলোতে শুধু নারীরাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। অন্য ওয়ার্ডগুলো নারী-পুরুষ সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। পরবর্তী নির্বাচনে আগের সংরক্ষিত ওয়ার্ডগুলো উন্মুক্ত করে দিয়ে অন্য এক-তৃতীয়াংশ ওয়ার্ড নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা হবে। এভাবেই আসন সংরক্ষণের পদ্ধতি ঘূর্ণমান থাকবে। এতে একদিকে যেমন ওয়ার্ড পর্যায়ে দায়িত্ব পালনে দ্বৈততা থাকবে না, পাশাপাশি নারী জনপ্রতিনিধির সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্বাচন ছিল নির্দলীয়। ২০১৫ সালে আইনে পরিবর্তন এনে রাজনৈতিক দলভিত্তিক নির্বাচনের বিধান করা হয়। এতে বিরাজমান দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতির নেতিবাচক প্রভাব যেমন গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়; পাশাপাশি রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কবহির্ভূত জনকল্যাণে নিবেদিত নাগরিকদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং নির্বাচিত হয়ে আসার সুযোগ সংকুচিত হয়ে পড়ে। এসব কারণেই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন নির্দলীয়ভাবে হওয়াই শ্রেয়।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সংসদ সদস্যদের হস্তক্ষেপ প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাধীনতার পরিপন্থী। আইনানুযায়ী সংসদ সদস্যরা বর্তমানে উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা। আইনের এই সুযোগে সংসদ সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদসহ অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ওপরে খবরদারি করেন। স্থানীয় সরকারের কর্মকাণ্ডে সংসদ সদস্যদের এই হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করতে হবে। উল্লেখ্য, জেলামন্ত্রীর পদ সৃষ্টিকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা এক মামলার রায়ে বিচারপতি খায়রুল হক ও বিচারপতি ফজলে কবির স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সংসদ সদস্যদের জড়িত হওয়াকে ক্ষমতা পৃথক্‌করণ নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিবেচনায় একে অসাংবিধানিক ঘোষণা করেন [আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বনাম বাংলাদেশ, ১৬ বিএলটি (এইচসিডি) (২০০৮)]।

উপজেলা পরিষদের আরেকটি সমস্যা উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) দ্বৈত শাসন। এ ক্ষেত্রে পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। পাশাপাশি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বেশ কিছু বিভাগ উপজেলা পরিষদের হাতে ন্যস্ত করার কথা থাকলেও তা অদ্যাবধি কার্যকর হয়নি। এই দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটিয়ে পরিষদে জনপ্রতিনিধিদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

বর্তমানে প্রতিটি ইউনিয়ন ও পৌরসভায় ওয়ার্ড ৯টি করে। কিন্তু একটি ইউনিয়নের সঙ্গে আরেকটি ইউনিয়নের এবং একটি পৌরসভার সঙ্গে আরেকটি পৌরসভার জনসংখ্যার ব্যবধান অনেক। সেবার মানোন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠান দুটির ওয়ার্ড জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারণ এবং প্রয়োজনে ৯টির অধিক ওয়ার্ড নিয়ে ইউনিয়ন বা পৌরসভা গঠনের বিধান করা উচিত। সরকারি বরাদ্দ নির্ধারিত হবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে।

স্থানীয় সরকারের কার্যক্রমে জন-অংশগ্রহণের একটি অনন্য উদ্যোগ ইউনিয়ন পরিষদের ওয়ার্ড সভা; যা এখন চলছে অনেকটা দায়সারাভাবে। এগুলোকে এমনভাবে কার্যকর করতে হবে, যাতে জন-অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় ওয়ার্ডের সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমস্যা সমাধানের অগ্রাধিকার নির্ণয়, বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অংশীজনদের তালিকা তৈরি, পরিকল্পনা প্রণয়ন ইত্যাদি যেন যথাযথভাবে হয়। ওয়ার্ডসভার বিধানটি পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন আইনেও যুক্ত করা যেতে পারে। পাশাপাশি উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন ও স্থায়ী কমিটিগুলোকে সক্রিয় করার উদ্যোগ সব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে গ্রহণ করা উচিত।

নির্বাচন আয়োজন একটি ব্যয়বহুল আনুষ্ঠানিকতা। সব সময়ই নির্বাচন কমিশনকে ব্যস্ত থাকতে হয় এ নিয়ে। ব্যয়, সময় সাশ্রয়সহ জনকল্যাণে আত্মনিবেদনে আগ্রহী বিপুলসংখ্যক মানুষকে জনপ্রতিনিধি বাছাইপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার জন্য স্থানীয় সরকারের সব প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন একই সময়ে আয়োজন করা যেতে পারে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হওয়ায় একই ব্যক্তি ঘুরেফিরে সেগুলোতে প্রার্থী হয়েছে।

জনকল্যাণে কার্যকর অবদান রাখার জন্য ক্ষমতা ও দায়িত্বের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পদের প্রয়োজন রয়েছে। সম্পদের এই সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য 'স্থানীয় সরকারের তহবিল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সংগ্রহ করতে হবে'—এই বিভ্রান্তি থেকে বেরিয়ে এসে জাতীয় বাজেটের একটি অংশ স্থানীয় সরকারের নামে বরাদ্দ করতে হবে। পাশাপাশি এই প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য আরও আয়ের উৎস সৃষ্টি করতে হবে, প্রয়োজনীয় জনবল দিতে হবে এবং জনপ্রতিনিধিদের ভাতা সম্মানজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে।

পরিশেষে আমি মনে করি, সংস্কারপ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণের বিষয়টি অন্তর্বর্তী সরকার গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় নেওয়ায় দেশে শক্তিশালী ও কার্যকর স্থানীয় সরকারব্যবস্থা গড়ে তোলার এক অপূর্ব সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে; যা নিঃসন্দেহে আমাদের উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করবে।

উন্নত যোগাযোগব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

মো. হাদিউজ্জামান

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক

যোগাযোগ

জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়নের কাল বাস্তবসম্মত হওয়া উচিত। অবকাঠামোর কর্মক্ষমতা সর্বাধিক করার জন্য পরিচালনক্ষমতা বাড়াতে হবে।

গত দুই দশকে বেশ কয়েকটি বড় যোগাযোগ অবকাঠামো ও মেগা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু সমন্বিত পরিকল্পনা ও সুদূরপ্রসারী চিন্তার অভাবে চলাচলে গতিশীলতার সুবিধা পাওয়া গেলেও অর্থনৈতিকভাবে তেমন কোনো সুবিধা এখনো পাওয়া যাচ্ছে না। এ জন্য প্রকল্প নেওয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক ধারণার বাস্তবায়ন প্রয়োজন। আংশিক পরিকল্পনা মেগা প্রকল্পগুলোর পূর্ণ সম্ভাবনা ব্যাপকভাবে ব্যাহত করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কর্ণফুলী টানেলে প্রতিদিন যে পরিমান যানবাহন চলাচল করার কথা ছিল, বর্তমানে চলাচল করছে তার এক-চতুর্থাংশ। এতে সরকারকে বড় অঙ্কের লোকসান গুনতে হচ্ছে।

১৯৯৮ সালে চালু হওয়া চার লেনের যমুনা সেতুর দুই প্রান্তে ২৫ বছর পরে এসে দুই লেনের সড়ককে চার লেনে রূপান্তরিত করাকেও সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের (ফিজিবিলিটি স্টাডি) অসম্পূর্ণতা ও স্বল্পদৃষ্টি পরিকল্পনার ইঙ্গিত দেয়। কেননা, সেতুর দুই প্রান্তে চার লেনের সড়ক আগে বাস্তবায়ন করা গেলে যমুনা সেতু উত্তরাঞ্চল, তথা পুরো দেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) বেশি অবদান রাখতে পারত। আবার নির্মাণপদ্ধতি পরিবর্তিত জলবায়ুসহিষ্ণু না হওয়ায় এবং নির্মাণসামগ্রীর গুণগত মান ঠিক না থাকায় ব্যয়বহুল মহাসড়কও দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়ার নজির রয়েছে।

অপ্রয়োজনীয় রাজনৈতিক প্রকল্প নেওয়া, যথাসময়ে প্রকল্প শেষ না করা এবং সড়ক নির্মাণে বরাদ্দ থাকলেও রক্ষণাবেক্ষণে আলাদা কোনো বরাদ্দ না থাকার অভিযোগও আছে। পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রভাব, ঠিকাদারের সক্ষমতার ঘাটতি ও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ না থাকায় সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে তুলনামূলকভাবে বেশি খরচ হয় এবং সময়ও বেশি লাগে। যানজট নিরসনে শুধু উড়ালসড়ক নির্মাণ করা হয়, কিন্তু গ্রেড-সেপারেটেড ইন্টারচেঞ্জ তৈরি করা হয় না। এতে উড়ালসড়কগুলোয় ওঠানামার পথেই ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়।

যোগাযোগ খাতের সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রথমেই প্রয়োজন পরিকল্পনা কমিশনের সক্ষমতা তৈরি, যেখানে অত্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন পেশাদার পরিকল্পনাবিদেরা থাকবেন; থাকবে যেকোনো প্রকল্পের চুলচেরা বিশ্লেষণ করার সক্ষমতা এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করার পূর্বাভিজ্ঞতা। একই সঙ্গে জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো প্রকল্প বাস্তবায়নের কাল বাস্তবসম্মত হওয়া উচিত। অবকাঠামোর কর্মক্ষমতা সর্বাধিক করার জন্য পরিচালনক্ষমতা বাড়াতে হবে। মাল্টিমোডাল ইন্টেলিজেন্ট ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সিস্টেম, স্ট্রাকচারাল হেলথ মনিটরিং, ওভারলোড নিয়ন্ত্রণ, অনুমোদনহীন যানবাহনের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি উন্নত প্রযুক্তি যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রকল্পে সংযুক্ত করতে হবে। অবকাঠামোর গুণমান ক্রমাগত বাড়াতে হবে। অবকাঠামো এমন হতে হবে, যেখানে নিরাপত্তা, টেকসই সমাধান ও স্বপ্রবর্তিত নিয়ন্ত্রণের মেলবন্ধন ঘটে। যানজটের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য সেন্ট্রাল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এক্সপ্রেসওয়ে নেটওয়ার্ক তৈরির ক্ষেত্রে বর্তমানে অবস্থিত চলমান সড়ক নেটওয়ার্কে হস্তক্ষেপ না করে নতুন সম্পূর্ণ প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত ও বাধাহীন ইন্টারচেঞ্জ-সংলিত টেকসই উচ্চগতির আর্টেরিয়াল কনফিগারেশনের এক্সপ্রেসওয়ে তৈরির দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের গোল্ডেন কোয়াড্রিল্যাটারাল নেটওয়ার্ক একটি উত্তম উদাহরণ।

আমরা যখন উড়ালসড়ক, সড়ক ও এক্সপ্রেসওয়ের মতো অবকাঠামো নির্মাণ করি তখন প্রায়ই ভূমি ব্যবহারের বিষয়কে অবহেলা করি। ভূমি ব্যবহারের বিষয়টিকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে বেশ ভালো সড়কও চার থেকে পাঁচ বছর পর ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে শক্ত কোনো নীতি না থাকা এর অন্যতম কারণ। কিছুদিন পরেই সড়কের পাশে অবৈধ স্থাপনা বা হাটবাজার গড়ে ওঠে। তাতে ভালো সড়কও অল্প সময়ে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়। শুধু সড়ক নির্মাণ করলে হবে না, ভূমি ব্যবহারের সঙ্গে বৃষ্টির পানি নির্গমণের সমন্বয় করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভূমি ব্যবহারের বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে মহাসড়কে অবৈধ ও অননুমোদিত যান, হালকা যান চলাচল সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে অধিগ্রহণকৃত অতিরিক্ত জায়গা রাস্তার মাঝখানে রেখে দুই পাশের সীমানা ঘেঁষে সড়ক তৈরি করা ফলপ্রসূ। সে ক্ষেত্রে ভেতরের অব্যবহৃত জায়গা প্রশস্ত সড়ক বিভাজক হিসেবে কাজ করায় মুখোমুখি দুর্ঘটনার ঝুঁকি অনেকাংশেই কমিয়ে দেয় এবং প্রাকৃতিক ড্রেনেজ হিসেবে কাজ করার কারণে সড়কের ওপর পানি জমাট বেঁধে সড়কের কাঠামোগত ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কাও থাকে না।

রাস্তার পাশাপাশি সম্ভাবনাময় রেল ও নৌপথকেও সমান গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে সব যাতায়াতব্যবস্থাকে একটি একক জাতীয় মাস্টারপ্ল্যানের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এখানে মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় একটা বড় বিষয়। সমন্বয়ের বিষয়টি জটিল ও চ্যালেঞ্জিং। আমাদের সড়ক-মহাসড়ক বিভাগ সড়ক তৈরি করছে যানবাহনের গতি বাড়ানোর জন্য। সেখানে ভারী যানবাহন চলবে। আবার শিল্প মন্ত্রণালয় সোটরসাইকেল দিয়ে শিল্প বিকাশের কথা বলছে, যেখানে দুর্ঘটনার দায় কেউ নিতে চাইছে না। যদি সামষ্টিকভাবে চিন্তা করি, তাহলে কিন্তু মহাসড়কে উচ্চগতির মোটরসাইকেল চালাতে আমরা প্রস্তুত নই। উচ্চগতির মোটরসাইকেলগুলো কারা চালাবেন, কোথায় চলবে, এই নীতি ও পরিকল্পনায় যে দুর্বলতা রয়েছে, সেটাই আমাদের দুর্ঘটনার নাজুক পরিসংখ্যানের কারণ। তাই বিভিন্ন সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় খুবই জরুরি।

প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট সংস্থা করলেও দেশের যোগাযোগব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নৌপথ, স্থলপথ ও রেলপথ নিয়ে একটি সমন্বিত পরিবহন মাস্টারপ্ল্যান এখন সময়ের দাবি। আবার এই মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে কি না, তা তদারকির জন্য পরিবহন ও যোগাযোগ অবকাঠামো বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে। ঢাকা শহরের মানুষের কাছে মেট্রোরেলই প্রথম সত্যিকারের গণপরিবহন। সমন্বিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ব্যবস্থা না থাকায় আশপাশের যেকোনো দেশের মেট্রোরেলের তুলনায় আমাদের দেশের মেট্রোরেলের ভাড়া তুলনামূলক বেশি এবং গণপরিবহন নেটওয়ার্ক তৈরির পরিকল্পনায় ত্রুটি বিদ্যমান। রেলভিত্তিক মেট্রোরেলকে কেবল সময়সাশ্রয়ী গণপরিবহনব্যবস্থা হিসেবে নয়, তার সঙ্গে অন্য সড়কভিত্তিক গণপরিবহনের মেলবন্ধন প্রয়োজন। তাই ২০৩০ সালের মধ্যে ছয়টি মেট্রোলাইন করার পাশাপাশি ভালো মানের ফিডার কানেকটিভিটি করতে পারলে নেটওয়ার্ক থেকে যানজট নিরসনে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে। অন্যদিকে ক্রমাগত রেল দুর্ঘটনা দীর্ঘদিন ধরে রেলকে অবহেলা করার ফসল। দক্ষ জনবল ও আধুনিক যন্ত্রপাতির সংকটের পাশাপাশি সিগন্যালিং সিস্টেমের অসামঞ্জস্য অবস্থা মূলত এর জন্য দায়ী। রেললাইন বাড়ালেও অনেক ট্রেনের ইঞ্জিন-বগি এখনো পুরোনো। বেশ কিছু লোকোমোটিভ আছে, যেগুলোর আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে গেছে। রেল নেটওয়ার্কের একেক জায়গায় একেক রকম সিগন্যালিং সিস্টেম বিদ্যমান। কোথাও কম্পিউটারভিত্তিক ইন্টারলকিং সিস্টেম, কোথাও ম্যানুয়াল ইন্টারলকিং সিস্টেম এবং কোথাও ব্রিটিশ আমলের ইন্টারলকিং সিস্টেম কার্যকর। এগুলো রেলওয়ে পরিচালনাকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে। এ কারণে কখনো কখনো দুই ট্রেন একই লাইনে এসে পড়েছে।

নৌপথে চলাচলকৃত অনেক লঞ্চ বা ফেরির নেই কোনো ফিটনেস। একদিকে নৌপথগুলোয় নেই পর্যাপ্ত নাব্যতা, অন্যদিকে নিয়ন্ত্রণহীন বালু উত্তোলনের অসাধু প্রতিযোগিতা, তার সঙ্গে আছে অপরিকল্পিত ড্রেজিং সমস্যা। শক্ত তদারকির অভাবে প্রায়ই সম্মুখীন হতে হচ্ছে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনার। তাই সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও সংস্থার পাশাপাশি রেল ও নৌপরিবহন পরিচালনা ব্যবস্থাপনায়ও প্রয়োজন ব্যাপক সংস্কার।

টেকসই যোগাযোগব্যবস্থা ও স্বল্প ব্যয়ে রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজন প্রচুর গবেষণার। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন সড়ক গবেষণা ল্যাবরেটরি থাকলেও সেখানে রয়েছে নিয়মিত ও যোগ্য গবেষকের অভাব। তাই টেকসই সড়ক অবকাঠামোর জন্য সক্ষম গবেষক নিয়োগ ও নিয়মিত গবেষণার লক্ষ্যে সব প্রকল্প থেকে ১-২ শতাংশ অর্থ অন্যান্য উন্নত দেশের মতো এ খাতে বরাদ্দ রাখতে হবে। অন্যদিকে রেলে অভিন্ন ও আধুনিক সিগন্যাল সিস্টেম চালুর পাশাপাশি রেল পরিচালনায় দক্ষতা বাড়ানোর জন্য রেল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দক্ষ ও স্মার্ট জনবল তৈরি ও রেলের অবকাঠামো প্রকল্প থেকে অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে গবেষণা সচল রাখতে হবে।

নগরকেন্দ্রিক মেট্রোরেলের মতো ভারী ও ব্যয়বহুল অবকাঠামো তৈরির পাশাপাশি স্বল্প ব্যয়ে ও সময়ে বাস্তবায়নযোগ্য রেলভিত্তিক অন্যান্য গণপরিবহন, যেমন মনোরেল ও লাইট রেল ট্রানজিট-ব্যবস্থা নিয়েও আমাদের ভাবতে হবে।

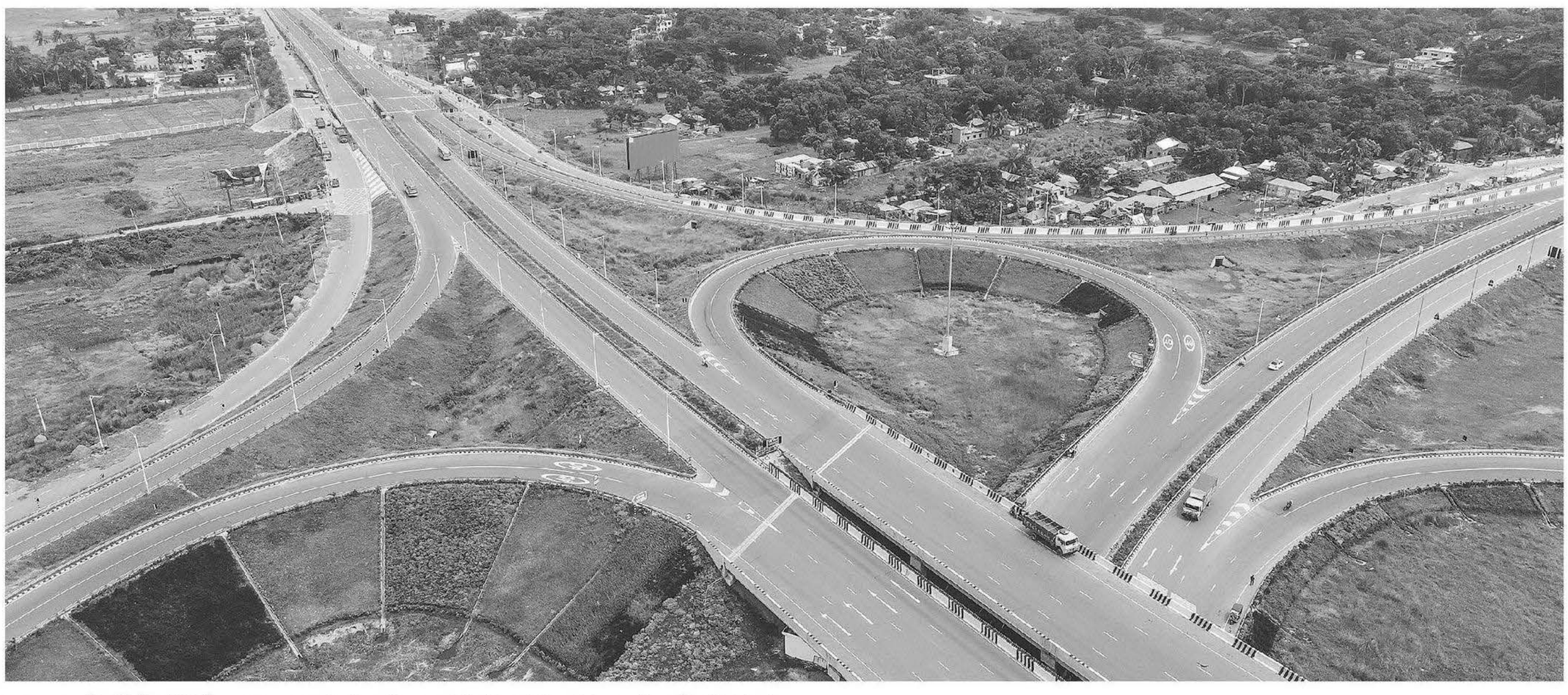

ব্যয়বহুল অবকাঠামো তৈরির পাশাপাশি স্বল্প ব্যয়ে ও সময়ে বাস্তবায়নযোগ্য সড়ক যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে। ছবি : প্রথম আলো

দেশের বহুল প্রচারিত জনপ্রিয় পত্রিকা প্রথম আলো-এর
২৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

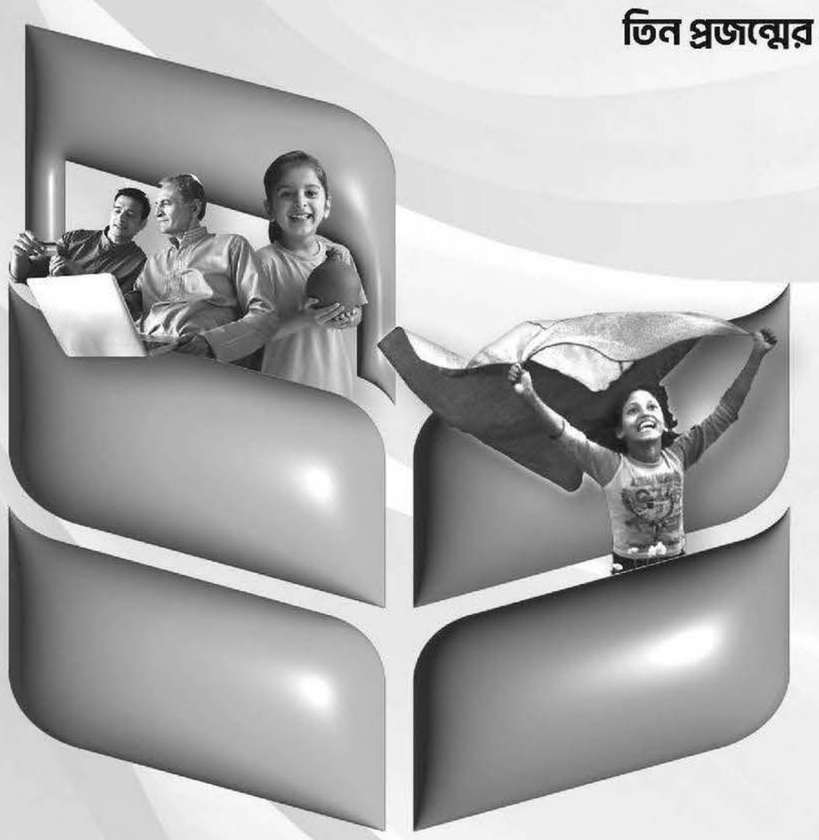

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে করণীয়

ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

টেকসই উন্নয়নবিষয়ক লেখক

জ্বালানি

দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধির বিশেষ দায়মুক্তি আইন বাতিল করে অন্তর্বর্তী সরকার বিদ্যুৎ খাতে রাষ্ট্রীয় বাজেট লুট, অপচুক্তি ও দুর্নীতি বন্ধের আইনি প্রস্তুতি সেরে রেখেছে। এ অবস্থায় দরকার মানহীন বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্যাপাসিটি চার্জ বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া। যেসব বিদ্যুৎকেন্দ্র জ্বালানি সরবরাহ থাকা সত্ত্বেও উচ্চ প্ল্যান্ট ফ্যাক্টরে অ্যাভেইলেবল বা সচল থাকতে পারে না, সেসবের চুক্তি পুনর্মূল্যায়ন কিংবা বাতিল করা দরকার। 'ডলার ড্রেনিং' ক্যাপাসিটি চার্জ বন্ধ না হলে বিদ্যুৎ খাতের অতিরিক্ত বিলের বোঝা থেকে সরকার বাঁচবে না।

পাশাপাশি সরকার নতুন কূপ খননে উচ্চাভিলাষী পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে ৪ বছরে ১০০ কূপ খোলার উদ্যোগ যাতে কাগুজে না থেকে যায়। সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে যে বছরে ৫-৯টি নতুন অনুসন্ধান কূপ খনন হবে। শুধু উন্নয়নকূপে প্রাধান্য না পায় কিংবা উন্নয়নকূপকে অনুসন্ধান কূপ হিসেবে দেখানোর কারিগরি জালিয়াতি না হয়।

অ্যাসেট মোবিলাইজেশন ও ফুয়েল প্ল্যানিং

দেশের কয়লাবিদ্যুৎ উৎপাদনের বড় সক্ষমতা উপকূলীয় এলাকায়। উপকূলীয় তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর (পায়রা, রামপাল, মাতারবাড়ী, বাঁশখালী) বিদ্যুৎ সঞ্চালন সক্ষমতার অভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিডের অব্যবহৃত কিংবা স্বল্প ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিগুলো মোবিলাইজ করে স্বল্প মেয়াদে এসব সমস্যা কাটানো যায়। এতে সরকার নিম্ন উৎপাদন খরচের বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর সর্বোচ্চ সুফল পাবে। এসব নতুন কয়লাবিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন খরচ ফার্নেস কেন্দ্র থেকে কম। উদাহরণ হিসেবে উৎপকূলীয় বিদ্যুতের ৪০০ কেভি আইল্যান্ড (পায়রা-আমিনবাজার এবং কক্সবাজার-মেঘনা ঘাট) থেকে মূল লোড সেন্টার ঢাকায় বিদ্যুৎ সঞ্চালনের সুফল আনতে গেলে ৪০০ কেভি বাস থেকে বিদ্যুৎকে ২৩০ কেভিতে নামাতে হয়। কিন্তু এখানকার ট্রান্সফরমারগুলোর সক্ষমতা কম। অন্যদিকে গোপালগঞ্জে একই সক্ষমতার অলস ট্রান্সফরমার রয়েছে, অ্যাসেট মোবিলাইজেশনে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা পরিহার করে স্বল্প মেয়াদেই বেশ কিছু অর্জন সম্ভব।

সরকার আগামী বছরকে লক্ষ্য করে বিদ্যমান অ্যাসেটের সর্বোচ্চ সাশ্রয়ী ব্যবহারের ইউজকেইজগুলো সাজিয়ে একটা সমন্বিত জ্বালানি, পরিকল্পনা করতে পারে, যাতে কম উৎপাদন খরচকেন্দ্রিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, সেখানকার বিদ্যুৎ সঞ্চালন, জ্বালানি পরিবহন থেকে আমদানি ঋণপত্র (এলসি)—সবকিছু গুরুত্ব পাবে।

জ্বালানি অবকাঠামো এবং স্থাপনার নিরাপত্তা প্রদান

কৌশলগত অর্থনৈতিক স্থাপনা হিসেবে বাংলাদেশের সব বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অবকাঠামোর জোরদার নিরাপত্তা ও নজরদারি করা দরকার দ্রুত। এগুলোকে 'কি পয়েন্ট ইনস্টলেশন' বা কেপিআই স্থাপনা হিসেবে শনাক্ত করে ক্রিটিক্যাল জাতীয় সম্পদ বিবেচনা করুন। ব্যবস্থাপনা ত্রুটি কিংবা অগ্নিসংযোগসহ যেকোনো ধরনের কিংবা নাশকতা থেকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহব্যবস্থা নিরাপদ করতে হবে। সম্প্রতি গভীর সমুদ্র থেকে ইস্টার্ন রিফাইনারিতে অপরিশোধিত তেল পরিবহনের দুটি জাহাজের একটিতে অগ্নিকাণ্ড কিংবা নাশকতা হয়েছে। এর আগে গ্যাস পাইপলাইনে সমস্যা হয়েছে। এরপর সাগরে এলপিজি ট্যাংকারে অগ্নিকাণ্ড হয়েছে। পরপর এতগুলো ঘটনা জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা এবং অর্থনীতির জন্য হুমকি। এদিকে ৮ হাজার ৩০০ কোটি টাকার সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) নামের তেলের পাইপলাইন প্রকল্পটি নিষ্ক্রিয় পড়ে আছে অপারেটরের অভাবে। এই প্রকল্প চালু না হওয়ায় দুটি লাইটার জাহাজের মাধ্যমে তেল আনতে হচ্ছে ইস্টার্ন রিফাইনারির প্ল্যান্টে। এতে তেল খালাসের সময় বেশি।

দুর্নীতিবান্ধব ক্রয়প্রক্রিয়ায় সংস্কার

কেন্দ্রীয় ক্রয় কমিটির (সিপিটিইউ) ভুল ও অদূরদর্শী পিপিএ/পিপিআর নামে আইনি প্রক্রিয়ার দোহাই দিয়ে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতকে অযোগ্য (মূলত চীনা ও ভারতীয়) সরবরাহকারীদের পুনর্বাসন কেন্দ্র বানানো হয়েছে। উন্মুক্ত দরপত্রের সর্বনিম্ন দরদাতাকে কাজ দেওয়ার নাম করে বিদ্যুৎ খাতে যাবতীয় নিম্নমানের যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রাংশ, নিশ্চয়তাহীন মেশিন ঢুকে গেছে। খুচরা যন্ত্রাংশ ও সাপোর্ট সিস্টেমের নামে ব্যালান্স অব প্ল্যান্ট (বিওপি) খাতে খরচ হয়ে যাচ্ছে শতকোটি ডলার। বিওপি বিদ্যুৎ বাজেট অপচয়ের আরেকটা বড় খাত। দরপত্রব্যবস্থায় মানহীন সরবরাহকারীদের কালো তালিকাভুক্তির বিধান দরকার।

নিম্ন জ্বালানি দক্ষতা ও নিম্ন প্ল্যান্ট ফ্যাক্টরের বিদ্যুৎকেন্দ্র বন্ধ

কয়েক ডজন বিদ্যুৎকেন্দ্রের জ্বালানি দক্ষতা ৩০ শতাংশের কম, অর্থাৎ অনেক বেশি জ্বালানি পুড়িয়ে এরা খুব কম বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। এতে আমদানিনির্ভর জ্বালানি সরবরাহের চাপ বাড়ে। বহু বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্ল্যান্ট-ফ্যাক্টর কম বলে একটানা সচল থাকতে পারে না। বড় সমস্যা ক্যাপটিভের কয়েক হাজার জ্বালানি অদক্ষ বিদ্যুৎকেন্দ্র। চরম জ্বালানি অদক্ষ সরকারি, বেসরকারি ও ক্যাপটিভের কেন্দ্রগুলো বিদ্যুৎ খাতের গলার ফাঁস। শীতের শেষে দেশে লোডশেডিং যত বাড়বে, ক্যাপটিভ বিদ্যুৎকেন্দ্র তত বেশি চলবে, জ্বালানি অপচয় এবং জ্বালানি আমদানির সমস্যাও ততই প্রকট হবে।

ঘন ঘন বন্ধ থাকা কিংবা আংশিক সচল বিদ্যুৎকেন্দ্রের মধ্যে যেগুলোর তাপীয় দক্ষতা ভালো, সরকারি কিংবা বেসরকারি যাহোক, সেগুলো সচল রাখার পরিকল্পনা দরকার। ৪০ শতাংশের বেশি জ্বালানি দক্ষতা এবং ৮০ শতাংশের বেশি প্ল্যান্ট-ফ্যাক্টর রয়েছে, এমন কেন্দ্রকে কারিগরি এবং আর্থিকভাবে প্রাধান্য দিলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি অপচয় থামানো যাবে।

আগামী গ্রীষ্মের স্বাভাবিক বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহকে লক্ষ্য করে বিদ্যুৎ উৎপাদন, তেল-গ্যাস সব ধরনের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ পরিবহনে দরকারি কারিগরি উদ্যোগ, ঋণপত্র খোলা এবং আর্থিক সংস্থাপনের ব্যবস্থা নিতে হবে। আমাদের এনার্জি প্ল্যানিং দুর্বল। পুরো বছর কী পরিমাণে কয়লা, ফার্নেস তেল, গ্যাস লাগবে, সেটা আগেই হিসাব করতে হবে, যা তিন মাস পরপর আপডেট করা হবে। অভ্যন্তরীণ গ্যাস উৎপাদনের এলএনজি আমদানির সাশ্রয়ী উৎস খুঁজতে হবে।

শিল্পবিদ্যুতের বিল কমিয়ে জ্বালানি-অবান্ধব ক্যাপটিভ থামানো

শিল্পবিদ্যুতের দাম বেশি বলে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে শিল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহের নিশ্চয়তা নেই বলে ক্যাপটিভে চলে গেছে মাঝারি থেকে বড় শিল্প। শিল্পমালিকেরা দাবি করেন, নিজস্ব গ্যাস জেনারেটরে উৎপাদন খরচ সরকারি মূল্যের মাত্র ৩ ভাগের ১ ভাগ পড়ে (অবশ্য এখানে গ্যাসের মিটার ইউনিট চুরি ও ঘুষের বিষয় জড়িত আছে)। সরকারি শিল্পবিদ্যুতের উচ্চমূল্যে একদিকে শিল্পপণ্য উৎপাদনের দাম বাড়ছে, অন্যদিকে ক্যাপটিভের নিম্ন দক্ষতার জেনারেটরে বেশি জ্বালানি পুড়ে কম বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় বলে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। সেই সঙ্গে বেশি জ্বালানি আমদানিতে ডলার ড্রেইনও হচ্ছে। ক্যাপটিভ বিদ্যুতের চাহিদা কমাতে সুস্পষ্ট 'শিল্প বিদ্যুৎ' সঞ্চালন, বিতরণ ও শিল্পসহায়ক সাশ্রয়ী বিলিং নীতিমালা প্রয়োজন।

বিদ্যুৎ, গ্যাস ও তেলে সিস্টেম লস থামানো

২০১৯-২০ অর্থবছর শেষে বিদ্যুতের সিস্টেম লস দাঁড়িয়েছে ৮ দশমিক ৭৩ শতাংশ। কারিগরি খাতে দীর্ঘ সঞ্চালন লাইনের লস ছাড়া অপরাপর উচ্চ সিস্টেম লস অগ্রহণযোগ্য। ছোট দেশ হিসেবে বাংলাদেশে লস সর্বোচ্চ ৩ শতাংশ হতে পারে, এর বেশি সিস্টেম লস মানেই চুরি। গ্যাস বিতরণ ও তেল বিতরণ খাতেও রয়েছে অযৌক্তিক সিস্টেম লস। কাঠামোগত সিস্টেম লসের 'চুরি ও দুর্নীতি' থামিয়ে জ্বালানি সাশ্রয়ের স্বচ্ছ পরিকল্পনা দরকার।

সবুজ বিদ্যুৎ রোডম্যাপ বাস্তবায়ন

স্রেডা ও ইউএনডিপির তত্ত্বাবধানে তৈরি 'ন্যাশনাল সোলার এনার্জি রোডম্যাপ ২০২১-৪১' মতে, জমির স্বল্পতা সত্ত্বেও সৌরবিদ্যুতায়নের মধ্যমানের কৌশলে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশে ২০ হাজার মেগাওয়াট সবুজ বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। অন্যদিকে নদী অববাহিকা উন্নয়নের ৫ শতাংশ ভূমি, শিল্পাঞ্চলের রুফটপ ১৫ শতাংশ ভূমি প্রভৃতি নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের সৌর স্থাপনা মডেলে এই সক্ষমতা ৩০ হাজার মেগাওয়াটে পৌঁছানো সম্ভব।

জ্বালানি আমদানিনির্ভরতা থেকে বের হতে চাইলে সরকারকে স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত বাস্তবায়নে 'ন্যাশনাল সোলার এনার্জি রোডম্যাপ ২০২১-৪১'কে আলোর পথে নিতে হবে। বিদ্যুতের মাস্টারপ্ল্যান পিএসএমপি-২০১৬ মতে, ২০২১ সালের মধ্যেই নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ মোট সক্ষমতার অন্তত ১০ শতাংশ হওয়ার কথা ছিল। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এসডিজি-৭ মতে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য মোট ব্যবহৃত বিদ্যুতের ১২ শতাংশ নবায়নযোগ্য করার শর্ত আছে। বাংলাদেশ এলডিসি উত্তরণের শক্তিশালী প্রার্থী বলে ব্যবহৃত বিদ্যুতের ১৭ শতাংশ নবায়নযোগ্য রাখার শর্ত মানা উচিত, যা নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের জন্য প্রযোজ্য। বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের বর্তমান অবস্থান (মাত্র সাড়ে ৪ শতাংশ) অগ্রহণযোগ্য।

'সোলার হোম' পলিসি সংস্কার করে ব্যক্তি খাতে বিদ্যুৎ বিক্রির বৈধতা

ব্যক্তিকে সৌরবিদ্যুৎ বিক্রির অনুমতি ও অবকাঠামো সহযোগিতা দিতে হবে। ব্যক্তি নিজস্ব বিনিয়োগে উৎপাদিত সৌরবিদ্যুৎ স্টোর করবেন, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিক্রি করবেন। এ জন্য বিতরণব্যবস্থাকে স্মার্ট করতে হবে, এতে এই খাতে বিনিয়োগের বিপ্লব হবে। বিদ্যুৎ বিতরণকারী ডেসা-ডেসকো-পল্লী বিদ্যুৎ এখানে ফ্যাসিলিটেটর হবেন। প্রত্যন্ত অঞ্চল ও দ্বীপ এলাকায় খরুচে সঞ্চালন প্রকল্পে বিদ্যুৎ না নিয়ে বরং সেখানে নবায়নযোগ্য সৌর ও বায়ুবিদ্যুৎ উৎপাদনে অগ্রাধিকার ও প্রণোদনা দরকার। দরকার ব্যক্তি বিনিয়োগে উৎপাদিত বিদ্যুৎ বিক্রির উপযোগী কমিউনিটি গ্রিড। সবুজ বিদ্যুতের সোলার প্যানেল, ডিসি বিদ্যুৎ সরঞ্জাম ও ব্যাটারিতে শুল্ক উঠিয়ে দেওয়া দরকার। সোলার বিনিয়োগের ব্যাংকঋণের নতুন মডেল দরকার, দরকার ব্যাটারি রিসাইকেল ব্যবস্থাকে পরিবেশবান্ধব করা। সবুজ বিদ্যুৎ বাড়লে জ্বালানি আমদানির চাহিদা কমে ডলার সাশ্রয় হবে। ভূমিস্বল্পতার বাংলাদেশে মানসম্পন্ন স্টোরেজসহ শহুরে ও গ্রামীণ সোলার হোমের ব্যাপক বিকাশ দরকার।

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য সমন্বিত ইকোসিস্টেম তৈরি

স্বল্প মেয়াদে প্রশাসনের কর্মকর্তা ও ধনিক শ্রেণির ব্যক্তিগত গাড়ির বদলে গণপরিবহন বাড়ানো, বাসেরসহ গণপরিবহনের টিকিট সস্তা করে, দূরপাল্লার ট্রেন বাড়িয়ে ব্যক্তিগত গাড়িতে অনুৎসাহ তৈরি করতে হবে। শিল্পে ও ব্যবসায় বিদ্যুৎসাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহারবান্ধব শুল্কায়ন পলিসি প্রয়োজন। এসি, ওয়াশিং মেশিন, ওভেন, ফ্রিজ, লিফট ইত্যাদিতে এনার্জি সেভিং যন্ত্র ব্যবহারে শুল্ক হবে। কম বিদ্যুৎ ব্যবহারে কম বিল, বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহারে বেশি বিলের পরিবেশবান্ধব পলিসি সাজাতে হবে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে মৌখিক আহ্বানে কাজ হবে না; বরং একটি ইকোসিস্টেম তৈরি করতে হবে।

> আগামী গ্রীষ্মের স্বাভাবিক বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহকে লক্ষ্য করে বিদ্যুৎ উৎপাদন, তেল গ্যাস সব ধরনের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ পরিবহনে দরকারি কারিগরি উদ্যোগ, ঋণপত্র খোলা এবং আর্থিক সংস্থাপন ব্যবস্থা নিতে হবে।

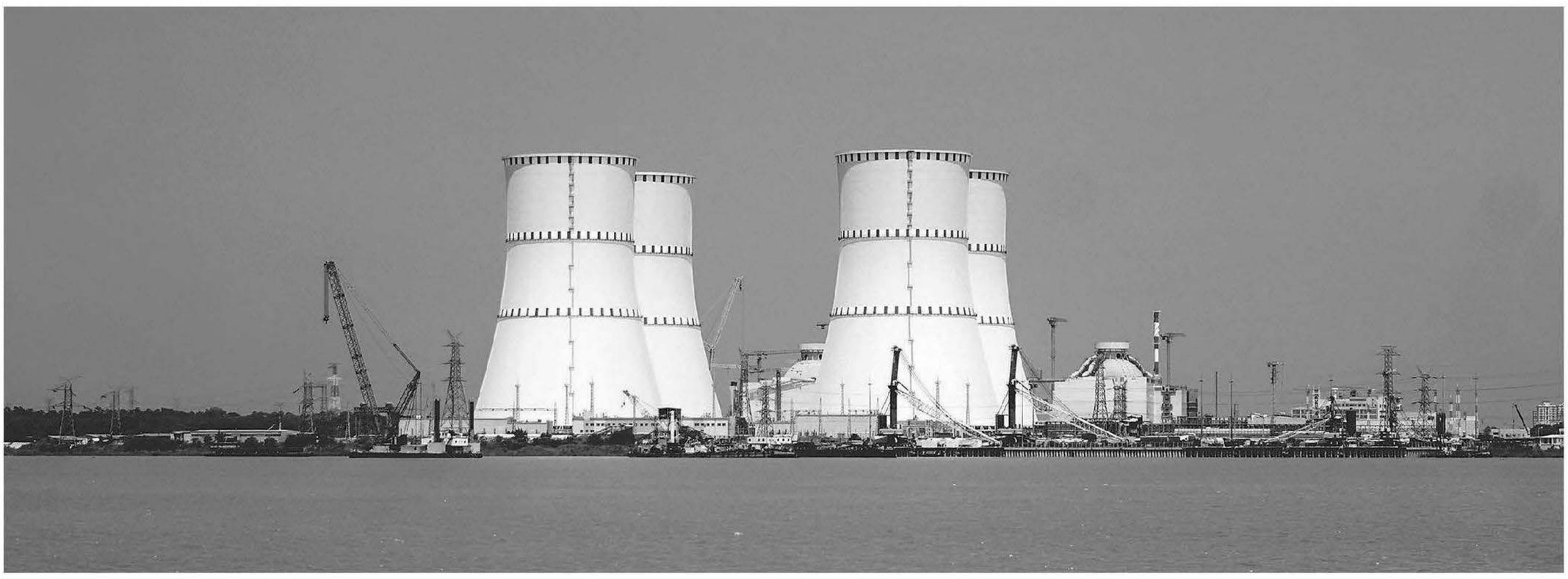

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। ছবি : প্রথম আলো

পরিবেশের জন্য সমন্বিত পদক্ষেপ

শামসুদ্দিন শহিদ

ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি মালয়েশিয়ার পানি ও পরিবেশ প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক

পরিবেশ

বাংলাদেশ পৃথিবীর ঘনবসতিপূর্ণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশগুলোর একটি। এর ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূপ্রকৃতি দেশের মানুষের জীবনযাত্রার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে আসছে। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর মিলিত প্রবাহ ও বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী অবস্থান দেশটিকে প্রায়ই বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি করে। এ ছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবসৃষ্ট বিপর্যয়ের কারণে পরিবেশগত সমস্যাগুলো ক্রমেই বেড়ে চলেছে। শিল্পায়ন, দ্রুত নগরায়ণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অপরিকল্পিত ব্যবহারের ফলে দেশের পরিবেশের ওপর গভীর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পরিবেশগত টেকসই অবস্থা ও উন্নয়নের ওপর আলোকপাত করা জরুরি।

ভূপ্রকৃতি ও ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর সম্মিলিত প্রবাহের কারণে প্রতিবছর বাংলাদেশে প্রায় ১১ দশমিক ৭ গুণ বেশি পানি নিষ্কাশিত হয়। ফলে বড় বন্যার সময় প্রায় ২২০ কোটি মার্কিন ডলারের ক্ষতি হয়, যা দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় দেড় শতাংশ। পাশাপাশি, ঘূর্ণিঝড়ও দেশের উপকূলীয় এলাকায় বড় ধরনের বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উপকূলীয় অঞ্চলে ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে প্রাণহানি ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় প্রায় ১ শতাংশ সাইক্লোনিক ঝড় আঘাত হানে, যা এই অঞ্চলকে বিশ্বের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে পরিচিত করে তুলেছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি মানবসৃষ্ট বিপদ যেমন বায়ু ও পানিদূষণ দেশের পরিবেশকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। রাজধানী ঢাকা ও অন্যান্য প্রধান শহরে বায়ুদূষণ এখনো নিয়ন্ত্রণে আসেনি। যানবাহন, শিল্পকারখানার ধোঁয়া এবং নির্মাণকাজের ফলে ঢাকার বায়ু সব সময় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) নির্ধারিত মানের নিচে থাকে। বায়ুদূষণের কারণে প্রতিবছর প্রায় ২ লাখ ৭২ হাজার মানুষের অকালমৃত্যু হয়। বিশেষ করে, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে বায়ুদূষণ, যা শিশুদের আইকিউ হ্রাসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

নদী ও খালের পানিদূষণ বাংলাদেশের আরেকটি বড় সমস্যা। ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী একসময় শহরের প্রধান পরিবহন ও বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত হতো, বর্তমানে শিল্পবর্জ্য এবং গৃহস্থালির ময়লার কারণে বিষাক্ত জলাধারে পরিণত হয়েছে এই নদী। শিল্পকারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য পানিতে মিশে জনস্বাস্থ্য, কৃষি এবং সামগ্রিক পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

সম্প্রতি প্লাস্টিক দূষণও বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুতর হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। দেশে প্রতিবছর প্রায় ৮ লাখ টন প্লাস্টিক বর্জ্য উৎপন্ন হয়, যার প্রায় ৩৬ শতাংশ পুনর্ব্যবহারযোগ্য নয়। প্লাস্টিকের এই বর্জ্য শহরের পয়োনিষ্কাশনব্যবস্থা বন্ধ করে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করছে এবং বন্যার ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। মাইক্রোপ্লাস্টিক সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে এবং দীর্ঘ মেয়াদে তা মানবস্বাস্থ্যেও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। যদিও ২০02 সালে বাংলাদেশ একক ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ব্যাগ নিষিদ্ধ করেছে, এর কার্যকর বাস্তবায়নের অভাবে প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

নগরায়ণ এবং জলাভূমির পরিমাণ হ্রাস বাংলাদেশের পরিবেশের ওপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলছে। শহরাঞ্চলে জলাভূমি ভরাট করে নির্মাণকাজ চালানোর ফলে জলাবদ্ধতা, পানিনিষ্কাশনের সমস্যা ও মশাবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া ও ম্যালেরিয়া সংক্রমণ বেড়ে চলেছে, যা জনস্বাস্থ্যের ওপর বড় ধরনের প্রভাব ফেলছে। শহরের অপরিকল্পিত সম্প্রসারণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব দেশের পরিবেশগত অবস্থাকে আরও জটিল করে তুলছে।

গত তিন দশকে বাংলাদেশ সরকার প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও পরিবেশগত সমস্যা সমাধানে নানা নীতিমালা এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তবে এসব নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়নে প্রায়ই ঘাটতি দেখা যায়। সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রায়ই পরিবেশগত দিক উপেক্ষিত হয়, যা দেশের দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশগত টেকসই অবস্থায় প্রভাব ফেলে। উদাহরণ হিসেবে বন্যাপ্রবণ এলাকায় নির্মাণকাজ, নদীর তীর ভরাট করে স্থাপনা নির্মাণ এবং সংরক্ষিত বনভূমি উজাড় করে শিল্প স্থাপন পরিবেশগত সমস্যাকে আরও ঘনীভূত করছে।

সুন্দরবনের মতো সংরক্ষিত বনভূমিতে কয়লাভিত্তিক মেগা পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এই বনভূমি দেশের উপকূলীয় অঞ্চলকে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা থেকে রক্ষা করে এবং স্থানীয় মানুষদের জীবিকা নির্ভরশীলতার উৎস হিসেবে কাজ করে। বনভূমি উজাড়ের ফলে উপকূলীয় অঞ্চলগুলোয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি বাড়ছে, যা দেশের বাস্তুতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং ঘন ঘন তীব্র আবহাওয়ার ঘটনা দেশের কৃষি, অবকাঠামো এবং জনস্বাস্থ্যের ওপর গভীর প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে ঝুঁকির মুখে পড়েছে, যার ফলে উপকূলীয় জনগোষ্ঠী বাস্তুচ্যুত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কৃষির ওপরও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পড়ছে। জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো এবং জলবায়ু-স্মার্ট কৃষি পদ্ধতিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

বাংলাদেশের পরিবেশগত সমস্যা সমাধানের জন্য একটি সমন্বিত ও টেকসই কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা অপরিহার্য। প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনা, যেমন বনভূমিতে বৃক্ষ পুনঃরোপন, টেকসই মৎস্য চাষ এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তি উৎসের ব্যবহার পরিবেশগত সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে। বিশেষ করে নবায়নযোগ্য শক্তি, যেমন সৌর, বায়ু ও জৈব শক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে পরিবেশগত ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব। একই সঙ্গে জনসচেতনতা বাড়ানোর মাধ্যমে পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীলতার উন্নয়ন করতে হবে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনাও দেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। একটি কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যা বর্জ্য কমানো, পুনর্ব্যবহার ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য উপকরণের ওপর ভিত্তি করে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা যেতে পারে। শিল্প ও নগরায়ণে বায়ু ও পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর নীতিমালা প্রয়োগ করতে হবে, যাতে পরিবেশগত সমস্যার দ্রুত সমাধান হয়।

বাংলাদেশের পরিবেশগত সমস্যাগুলোকে মোকাবিলা করতে হলে একটি কার্যকর ও সমন্বিত নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে, যা দেশের দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশগত সুরক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। সরকার এবং জনগণের যৌথ উদ্যোগে পরিবেশগত সমস্যার সমাধানে কাজ করতে হবে। বিশেষ করে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষার উদ্যোগ নিলে তা আরও কার্যকর হতে পারে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের মাধ্যমে পরিবেশগত চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।

যদি বাংলাদেশ পরিবেশ রক্ষার জন্য টেকসই পদক্ষেপ নিতে পারে, তবে দেশটি বিশ্বে একটি রোল মডেল হয়ে উঠতে পারে, যা ভবিষ্যতের প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ এবং টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করবে।

> বাংলাদেশের পরিবেশগত সমস্যাগুলোকে মোকাবিলা করতে হলে একটি কার্যকর ও সমন্বিত নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে, যা দেশের দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশগত সুরক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

সুন্দরবনের মতো বনভূমি দেশের উপকূলীয় অঞ্চলকে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা থেকে রক্ষা করে। ছবি : প্রথম আলো

নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের জনপ্রশাসন

কাজী মারুফুল ইসলাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক

জনপ্রশাসন

বাংলাদেশের জনমানুষের মধ্যে একটি নতুন স্বপ্ন জাগ্রত হয়েছে জুলাই-আগস্ট ২০২৪-এর গণজাগরণের মধ্য দিয়ে। রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিসেবে বাংলাদেশের মানুষ আজ এক নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত বিনির্মাণের ঐতিহাসিক অভিপ্রায়ে একতাবদ্ধ। এই অভিপ্রায়ের প্রায়োগিক প্রয়াসে মানুষ এখন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনর্গঠন করার সাহস পাচ্ছে। জনপ্রশাসন সংস্কার এই জন-অভিপ্রায় বাস্তবায়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্ষেত্র। এই পরিবর্তনের গতিমুখ তাই বিদ্যমান প্রশাসনিক কাঠামোর বৈষম্যমূলক দিকগুলো পরিবর্তন করে একটি অধিকতর স্বচ্ছ, নাগরিক-বান্ধব, জবাবদিহিমূলক ও নিরপেক্ষ পেশাদার জনপ্রশাসন গড়ে তোলার দাবিকে জোরালো করে তুলেছে।

জনপ্রশাসন যেকোনো আধুনিক রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে, তাই এর কার্যকর সংস্কার ছাড়া রাষ্ট্রের কাঠামোগত পরিবর্তন অসম্ভব। কিন্তু এ দেশে যুগের পর যুগ ধরে চলা রাজনৈতিক দলীয়করণ, ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং প্রশাসনিক দুর্নীতি পুরো ব্যবস্থাকে অকার্যকর ও জনবিমুখ করে তুলেছে। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ম্যাক্স ভেবার যেমন আধুনিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন, তেমনি বাংলাদেশেও কার্যকর প্রশাসন ছাড়া আধুনিক রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়। কিন্তু আজকের বাংলাদেশে যেসব প্রশাসনিক সংকট বিদ্যমান, তা শুধু কয়েকটি ওপরভাসা পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাধান করা যাবে না, প্রয়োজন কাঠামোগত রূপান্তরের।

বাংলাদেশে প্রশাসনিক সংস্কারপ্রচেষ্টার একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ১৯৭২ সাল থেকে বিভিন্ন সরকার প্রশাসনকে জনমুখী ও দক্ষ করার লক্ষ্যে ১২টি কমিশন ও কমিটি গঠন করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রশাসনিক সার্ভিস পুনর্গঠন কমিটি (১৯৭২); পে অ্যান্ড সার্ভিস কমিশন (১৯৭৭); প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্গঠন কমিটি (১৯৮২); স্থানীয় সরকার কমিশন (১৯৯৭) এবং জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন (২০০০)। এসব কমিশন ও কমিটির মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনিক কাঠামোকে আধুনিক করা এবং সরকারি সেবার মান উন্নয়ন করা। তবে দুঃখজনক হলেও সত্যি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংস্কারের এই উদ্যোগগুলো সামান্যই সফলতা অর্জন করতে পেরেছে।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে গঠিত প্রথম কমিশন একটি একীভূত শ্রেণিহীন সিভিল সার্ভিস গঠন এবং বেতনকাঠামো সংস্কারের সুপারিশ করে। কিন্তু তৎকালীন মুজিব-সরকার বেশির ভাগ সুপারিশ বাস্তবায়ন করেনি। পরবর্তী সময়ে জিয়া সরকারের আমলে ১৯৭৭ সালে গঠিত হয় পে অ্যান্ড সার্ভিস কমিশন। এই কমিশনও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রস্তাব নিয়ে আসে, যেমন সিনিয়র সার্ভিস পুল গঠন। অল্প কিছুদিন টিকে থাকার পর প্রশাসনিক প্রতিরোধের মুখে এ ব্যবস্থা বাতিল হয়।

শেষ পর্যন্ত এই কমিশনের প্রভাব মূলত সামরিক কর্মকর্তাদের বেসামরিক প্রশাসনে অন্তর্ভুক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৮২ সালে এরশাদের শাসনকালে কিছু উল্লেখযোগ্য সাংগঠনিক পরিবর্তন আনা হয়, বিশেষ করে ক্যাডার সার্ভিসের পুনর্গঠন এবং উপজেলা পরিষদ গঠনের মাধ্যমে সেখানে জনসেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরগুলোর কার্যাবলিকে বিকেন্দ্রীকরণ করা। এরশাদ সরকার তৎকালীন সরকারি চাকরিজীবী ও পেশাজীবীদের প্রবল বাধার মুখেও এই পরিবর্তনগুলো আনতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু এরশাদ সরকারের গ্রহণযোগ্যতা ও বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন থাকায় হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের আমলে গৃহীত সংস্কার পদক্ষেপগুলো নব্বই-পরবর্তী বিএনপি সরকার বাতিল করে দেয়। জনপ্রশাসনে আবার পুরোদস্তুর ঔপনিবেশিক ক্ষমতাসম্পর্ক ফিরে আসে। এরপরও একাধিক কমিটি ও কমিশন কাজ করেছে, তবে প্রকৃত অর্থে কোনো দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই পরিবর্তন সম্ভব হয়নি।

এর মূল কারণ প্রশাসনিক সংস্কারের প্রস্তাবগুলো প্রায়ই প্রশাসনের ভেতর থেকে তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। সিভিল সার্ভিস, বিশেষ করে প্রশাসন ক্যাডারের সদস্যরা তাঁদের ক্ষমতা ও প্রভাব হারানোর ভয়ে পরিবর্তনের প্রতি অনাগ্রহ দেখিয়েছেন। এ ছাড়া প্রশাসনিক সংস্কারের পক্ষে সরকারের মধ্যে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব ছিল। বাস্তবায়নের জন্য অধিকাংশ কমিশনের সুপারিশ কোনো সরকারই যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি। কেবল কিছু কসমেটিক পরিবর্তন হয়েছে।

মোটাদাগে, বাংলাদেশের জনপ্রশাসনে বেশ কিছু কাঠামোগত সংকট বেশ স্পষ্টই চোখে পড়ে। প্রথমত, প্রশাসন এবং জনগণের মধ্যে প্রায় অনতিক্রম্য দূরত্ব বিরাজ করে, যা একধরনের 'দাস-প্রভু' সম্পর্ক বজায় রাখছে। জনগণের জন্য প্রশাসনের কাজ করার মনোভাবের বদলে একধরনের ঔপনিবেশিক মনস্তত্ত্ব প্রচলিত রয়েছে। এই মনোভাবকে সম্পূর্ণরূপে জনবান্ধব করতে হবে, যেখানে প্রশাসন জনগণের প্রকৃত সেবক হিসেবে কাজ করবে।

দ্বিতীয়ত, প্রশাসনের জবাবদিহির অভাব প্রকট। এই কাঠামো পরিবর্তন করে প্রশাসনকে নাগরিকদের কাছে সরাসরি জবাবদিহিমূলক করতে হবে, যাতে প্রশাসন তার কার্যকলাপের জন্য জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকে।

তৃতীয়ত, জনপ্রশাসনের রাজনৈতিক দলীয়করণ। অতীতের সরকারগুলো প্রায়ই রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ ও পদোন্নতি দিয়েছে, যা প্রশাসনের দক্ষতা ও স্বচ্ছতা হ্রাস করেছে। এই দলীয়করণ ও পক্ষপাতমূলক নীতির পুরোপুরি বিলুপ্তি দরকার। এ ক্ষেত্রে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ পরীক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন এবং যাতে চাকরিপ্রার্থীদের মেধার মূল্যায়ন সঠিকভাবে হয়, সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া। তা ছাড়া সরকারি চাকরিতে প্রচলিত অপআইনগুলো খুঁজে সেগুলো বাতিলের সুপারিশ করা। এ ছাড়া রাজনৈতিক বিবেচনার বদলে পদোন্নতি এবং গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়নের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে মেধা, দক্ষতা ও প্রশাসনিক জ্ঞানের মূল্যায়নের বিজ্ঞানসম্মত নিরপেক্ষ ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

চতুর্থত, বর্তমান জনপ্রশাসনে আন্তক্যাডার বৈষম্য প্রকট। জনপ্রশাসনে সবচেয়ে প্রভাবশালী সার্ভিস প্রশাসন ক্যাডার। প্রশাসন ক্যাডারে যে বাড়তি সুবিধা দেওয়া হয়েছে, তা অন্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে। এর ফলে জনপ্রশাসনের সামগ্রিক দক্ষতায় নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, যা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য এবং সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে কর্মসন্তুষ্টি অর্জনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রশাসন ক্যাডারের বাইরে অন্য সব ক্যাডারের কর্মকর্তাদের সঙ্গে এই বৈষম্য নিরসন করা জরুরি এবং প্রশাসনের পদোন্নতি, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধার ক্ষেত্রে একটি স্বচ্ছ ও সমতাভিত্তিক নীতি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

এ ছাড়া রয়েছে ক্যাডার বনাম নন-ক্যাডার বৈষম্য। যথেচ্ছভাবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, সিভিল প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের নিয়োগ, বিভিন্ন ভাতার নামে বিশেষ কর্মকর্তাদের আর্থিক সুবিধাসহ নানাবিধ বৈষম্যপূর্ণ চর্চা ও বিধি প্রচলিত আছে।

জনপ্রশাসনের অনেক সমস্যার মূলে রয়েছে এর অত্যধিক কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণপ্রক্রিয়া। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, প্রশাসনকে জনমুখী করতে হলে উন্নয়ন কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীকরণ অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কার্যকর বিকেন্দ্রীকরণে জোর দেওয়া উচিত, যাতে স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের চাহিদা ও সমস্যা সরাসরি প্রতিফলিত হয়। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতায়ন করে সরকারি কর্মকর্তাদের তাঁদের নিয়ন্ত্রণের আওতায় ন্যস্ত করা উচিত, যাতে স্থানীয় জনগণের কাছে জবাবদিহির পরিবেশ তৈরি হয়। বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার ধারাবাহিকতা ভেঙে স্থানীয় বাস্তবতা এবং চাহিদা অনুযায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

এই সংকটগুলো মোকাবিলা করে জনপ্রশাসনে বৈষম্যমূলক প্রথা এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত একটি পেশাদার কাঠামো গঠন করা এখন সময়ের দাবি। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীন নতুন জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন গঠিত হয়েছে। এই কমিশনকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে প্রশাসন সর্বদাই পরিবর্তনবিরোধী। তারা স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চায়। তাই প্রতিরোধ আসবে। এ জন্য প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ এবং বিস্তৃত মতবিনিময় করে তাঁদের আস্থা অর্জন করতে হবে। এই কমিশনকে বর্তমান সমাজ-অর্থনীতি ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনকে বিবেচনায় নিয়ে পূর্ববর্তী কমিশনের প্রতিবেদন ও উন্নয়ন সহযোগীদের বিভিন্ন সময় করা গবেষণা পর্যালোচনা করে এবং অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করে শিক্ষার্থী-জনতার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ তৈরি করতে হবে। সংস্কার প্রস্তাবগুলো স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য বিবেচনায় নিয়ে প্রণয়ন করতে হবে।

সংস্কারের পথে বাধা আসা অস্বাভাবিক নয়। তাই প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ মোকাবিলায় শক্তিশালী কৌশল গ্রহণ করতে হবে। অংশীজনদের, বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বোঝাপড়া তৈরি করে প্রশাসনের ভেতরে-বাইরে একটি শক্তিশালী সমর্থকগোষ্ঠী গড়ে তোলা জরুরি। জনমত গঠন, অংশীজনের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। একই সঙ্গে সংস্কারের পক্ষে যথেষ্ট প্রণোদনার ব্যবস্থাও করতে হবে। অতীতের সংস্কারপ্রচেষ্টাগুলো ব্যর্থ হওয়ার মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব। এবারের পরিস্থিতি ভিন্ন। দেশজুড়ে শিক্ষার্থী-জনতার শক্তি এবং পরিবর্তনের আহ্বানকে কাজে লাগিয়ে গতানুগতিক প্রশাসনিক কাঠামোর সংস্কার বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

> জনপ্রশাসনের অনেক সমস্যার মূলে রয়েছে এর অত্যধিক কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণপ্রক্রিয়া। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, প্রশাসনকে জনমুখী করতে হলে উন্নয়ন কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীকরণ অপরিহার্য।

বাংলাদেশ সচিবালয়। ছবি : প্রথম আলো

নতুন সময়ে প্রাসঙ্গিক থাকবেন কীভাবে

সুমন রহমান

সাহিত্যিক; ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশের শিক্ষক

সংস্কৃতি

> বিপ্লবোত্তর সময়ের শিল্পকলার কাজটা বহুমাত্রায় জটিল হয়ে পড়ে। কারণ, শিল্পীকে তখন একই সঙ্গে বিপ্লব ও শিল্পকে সমুন্নত রাখতে হয়। বিপ্লবকে সমুন্নত রাখার কাজটা তাঁকে করতে হয় প্রোপাগান্ডা মেশিনে পরিণত হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়ে।

একটা গণ-অভ্যুত্থান কিংবা বিপ্লব যেমন অনেক নতুন ধারণা হাজির করে, আবার অনেকগুলো পুরোনো এবং গেড়ে বসা ধারণা বা চিন্তা অপ্রাসঙ্গিক করে দেয়। এসব ধারণা কিংবা চিন্তা বহনকারী ব্যক্তিরাও স্বাভাবিকভাবে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যান। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের শেষ দিকে জনাকয় চলচ্চিত্রশিল্পী, নির্মাতার কিছু বার্তা ভাইরাল হলে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। তাঁরা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর 'গরম জল' ঢেলে দিতে বলেছেন, পুলিশকে আরও কঠোর হতে বলেছেন ইত্যাদি। আশ্চর্যের কিছু নেই। তাঁরা তাঁদের দাসত্বের দায় শোধ করেছেন। স্বাভাবিকভাবে এই নতুন
সময়ে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছেন। তাঁদের আদর্শিক মৃত্যু ঘটেছে। তাঁরা আর আপনাদের সামনে দাঁড়াতে পারবেন না।

এটা বলছি রাজনৈতিক বিচারের জায়গা থেকে। তাঁরা রাজনৈতিক দায় মেটাতে পারেননি, তাই অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে গেছেন নতুন সময়ে। কিন্তু নান্দনিক দায় অত সহজে শোধ হওয়ার নয়। রাজনৈতিকভাবে প্রাসঙ্গিক ছিলাম বলেই নান্দনিকভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠব, অতটা স্বয়ংক্রিয় নয় বিষয়টা। এমনকি ফ্যাসিস্টদের 'ফুট-সোলজার' না হয়েও আপনি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যেতে পারেন। আবার নতুন রাজনীতির ফ্রন্টলাইনার হলেই যে আপনার নান্দনিক গ্রহণযোগ্যতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেড়ে যাবে, এমনটাও নয়।

গত শতাব্দীর রুশ বিপ্লব থেকে এমন ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। জমিদার তলস্তয় কোনোভাবেই বিপ্লবের পক্ষের লোক ছিলেন না। তিনি ছিলেন সেই শ্রেণির প্রতিনিধি, যাঁদের বিরুদ্ধে রুশ বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। তবু তাঁকে বিচার করতে গিয়ে লেনিন বলেছিলেন, 'রুশ বিপ্লবের দর্পণ'। আবার রুশ বিপ্লবের ফ্রন্টলাইনার কবি মায়াকোভস্কির বিপ্লব-পরবর্তী লেখাজোখা নিয়ে প্রচুর সমালোচনা আছে। বিপ্লবের স্পিরিটের বিপরীতে থাকা অনেক লেখক যথা পাস্তেরনাক কিংবা ইয়েভতুশেঙ্কো অমরত্বের স্বাদ পেয়েছেন। আবার বিপ্লবের পক্ষে থাকা অনেকেই হারিয়ে গেছেন।

বিপ্লবোত্তর সময়ের শিল্পকলার কাজটা বহুমাত্রায় জটিল হয়ে পড়ে। কারণ, শিল্পীকে তখন একই সঙ্গে বিপ্লব ও শিল্পকে সমুন্নত রাখতে হয়। বিপ্লবকে সমুন্নত রাখার কাজটা তাঁকে করতে হয় প্রোপাগান্ডা মেশিনে পরিণত হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়ে। আবার শিল্পকে সমুন্নত রাখতে গিয়ে তাঁর চিন্তা কখনো কখনো বিপ্লবের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়।

আমাদের কবিতার কথা যদি ধরেন—মুক্তিযুদ্ধ এবং জাতীয়তাবাদী বয়ানের প্রথম শহীদ আমাদের শামসুর রাহমান। তিনি সরল বিশ্বাসে সে সময়ের সবচেয়ে প্রগতিশীল বয়ানের চর্চা করে গেছেন তাঁর কবিতায়। তুলনায় আল মাহমুদের পথপরিক্রমা ছিল জটিল। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের মহাবয়ানকেই সংহত করেছেন। তারপর ধীরে ধীরে সরে গেছেন। তখন বলা হয়েছে, আল মাহমুদ প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে গেছেন। যখন আফগানিস্তানে মুজাহিদদের উত্থানকে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে মৌলবাদের উত্থান বলে ধরা হতো, সে সময়ে আল মাহমুদ মুজাহিদদের বীরত্বগাথা রচনা করলেন কবিতায়। এভাবে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদী প্রকল্পে একজন মৌলবাদী হিসেবে শনাক্ত হয়ে রইলেন। বেশির ভাগ সাহিত্য পাতার প্রথম পাতা থেকে তাঁকে বাদ দেওয়া হলো। কিন্তু আল মাহমুদ টিকে রইলেন।

কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ায় লালন উৎসব। ছবি : কবির হোসেন

আমাদের সবচেয়ে গৌরবের অধ্যায়ের নাম মুক্তিযুদ্ধ। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ আওয়ামী লীগের একক সম্পত্তি কখনোই ছিল না। কিন্তু এটাকে ব্যাপকভাবে আওয়ামীকরণ করা হয়েছে। বিগত এক দশকে মুক্তিযুদ্ধের আওয়ামীকরণের মাত্রা ছিল ভয়াবহ। গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, সিনেমায় সবখানেই এর নজির মেলে। আপনি উপন্যাস লিখছেন, পুরস্কার পাবেন কি না, তা নির্ধারণ করবে আপনার উপন্যাসে থাকা মুক্তিযুদ্ধের আওয়ামী বয়ানটি। সিনেমা বানাবেন, চলচ্চিত্র অনুদান পাবেন কি না, সেটা নির্ধারণ করবে আপনি কার মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস নিয়ে সিনেমা বানাচ্ছেন। আওয়ামী লীগের প্রতি সহানুভূতিশীল লেখকের লেখা হলে আপনার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল বটে, কিন্তু আওয়ামী বয়ান থেকে বাদ পড়ে গেছেন মুক্তিযুদ্ধের অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কুশীলব। মুজিবময় এই ইতিহাসে ভাসানীর জায়গা নেই, সোহরাওয়ার্দীকে কেউ চেনে না, শেরেবাংলাকেও না।

এভাবে কি আওয়ামী লীগ নিজেদের জন্য খুব শক্তিশালী সংস্কৃতি-বয়ান বানিয়ে যেতে পেরেছে? বিপুল অর্থের অপচয় হয়েছে, কিন্তু বয়ান দাঁড়ায়নি। শেখ মুজিবের জীবনীভিত্তিক বড় বাজেটের ছবি বানানোর জন্য শ্যাম বেনেগালকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ছবিটি কোনো আবেদন তৈরি করতে পারেনি। স্কুলে স্কুলে বাধ্যতামূলকভাবে ছবিটি দেখানো হয়েছে। কয়েকটা স্কুল থেকে শুনলাম, ছবিতে যখন পঁচাত্তরের নির্মম হত্যাকাণ্ডটি ঘটে, তখন মিলনায়তনে কোনো শোকের আবহ তৈরি হয়নি। বরং ঠাট্টা-মশকরা এবং অনভিপ্রেত হুল্লোড়ের ঘটনা ঘটেছে। এটি তো পরিষ্কার প্রত্যাখ্যান। ফ্যাসিজমের কালচারাল বয়ান তৈরির ধান্দাবাজিকে প্রত্যাখ্যান। এক টাকার শুভ আর কোটি টাকার শ্যামকে প্রত্যাখ্যান। সেই প্রত্যাখ্যানের তিক্ত স্বাদ শেখ মুজিবকে দ্বিতীয়বারের মতো পেতে হলো।

এমন না যে ফ্যাসিবাদ কিংবা আগ্রাসনের সাংস্কৃতিক শিল্পভাষ্য তৈরি করলে সেটা আবেদনময় হবে না। জেমস বন্ডের মুভিগুলো স্নায়ুযুদ্ধে মার্কিন শক্তির তাঁবেদারি করার জন্যই তৈরি করা হয়েছে। সেগুলো শিল্পসফল ও ব্যবসাসফল ছিল। ভারতে হিন্দুত্ববাদকে ভালোই সেবা দিচ্ছে সিনেমা! কিন্তু বাংলাদেশে সেটা ব্যর্থ হয়ে গেল। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের ছবি মানেই বিনোদনহীন এবং প্রশ্নহীন আদর্শের প্রচার। সেই প্রচারে কোনো শৈল্পিক চাতুর্য নেই, কেবল একটা প্রায় ধর্মীয় অনুশাসনের মতো ব্যাপার আছে।

নতুন যে প্রজন্ম আসছে, যাদের আপনারা বলেন জেন-জি, তারাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই বয়ান প্রত্যাখ্যান করল। এই ছবি আদতে এদের উদ্দেশ্য করেই বানানো হয়েছিল, আমাদের জন্য নয়। আমরা তো প্রায় জন্ম থেকেই এই বয়ানের ভোক্তা। আওয়ামী লীগের রাজনীতির অংশ না হয়েও অনেকে এই বয়ান সমুন্নত রেখে চলেছেন। এটাই ছিল ফ্যাসিস্ট রেজিম তৈরি হওয়ার সবচেয়ে বড় শক্তির জায়গা।

এভাবেই হেজিমনি তৈরি হয়েছে ৫০ বছর ধরে। এই হেজিমনি সমাজে এখনো গেড়ে বসে আছে। ফ্যাসিজমের শারীরিক পতন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কালচারাল ফ্যাসিজমকে শনাক্ত করার এবং উপড়ে ফেলার লড়াই কেবল শুরু হয়েছে। এটা কোনো ব্যক্তিকে হাসলা-মাসলা করার ব্যাপার নয়। প্রবণতাগুলোকে চিনতে পারতে হবে। আওয়ামী বয়ানের বাইরে যে ব্যাপক বিস্তৃত মুক্তিযুদ্ধ এবং দেশ অর্জনের লড়াই, সেখানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জায়গা কোথায়, তার সঙ্গে বাঙালি মুসলমানের মন ও যাপনের মোকাবেলা কীভাবে হবে, সমাজতন্ত্রের লড়াই কোথায় থেমে গেল, ইনসাফের আর ন্যায়ভিত্তিক সমাজ তৈরির মোমেন্টাম কীভাবে শুরু হবে? এসবই জরুরি ভাবনার জায়গা।

নতুন সময়কেও ঠিকঠাক চিনতে পারার ব্যাপার আছে। আপনি সাহিত্য করবেন, মতাদর্শের আলখাল্লা থেকে ঠিকমতো বের হতে পেরেছেন তো? ফিল্ম বানাবেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই যে অযুত পরিমাণ বিদ্রোহ আর নির্মম হত্যাকাণ্ডগুলোর ফুটেজ ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই দৃশ্যগুলোর ওপর আপনি কীভাবে নান্দনিক সুবিচার করবেন? যে গানগুলো আপনি শুনেছেন এই অভূতপূর্ব সময়ে, কীভাবে তার ক্যাটাগরাইজেশন করবেন? ধনধান্য পুষ্পভরা থেকে কুন ফায়া কুন হয়ে আওয়াজ উড়া পর্যন্ত যে সাংগীতিক বিস্তার—এটাই এই বিপ্লবের সাউন্ডস্কেপ। এই সাউন্ডস্কেপের ওপর আছড়ে পড়ছে সাউন্ড গ্রেনেড, মাথার ওপর নিয়ত চক্কর মারছে হেলিকপ্টার। শিল্পী হিসেবে আপনার প্রাসঙ্গিকতা নির্ভর করছে আপনি দশক দশক ধরে তৈরি এই মায়াবী মতাদর্শের আলখাল্লা থেকে কতখানি বাইরে বেরোতে পারছেন তার ওপর। ইতিহাসকে ব্যাকট্র্যাক করে এই টুইস্টেড ন্যারেটিভের সঙ্গে যে জীবনপণ লড়াই করতে হবে, তার জন্য আপনার প্রস্তুতি কতখানি?

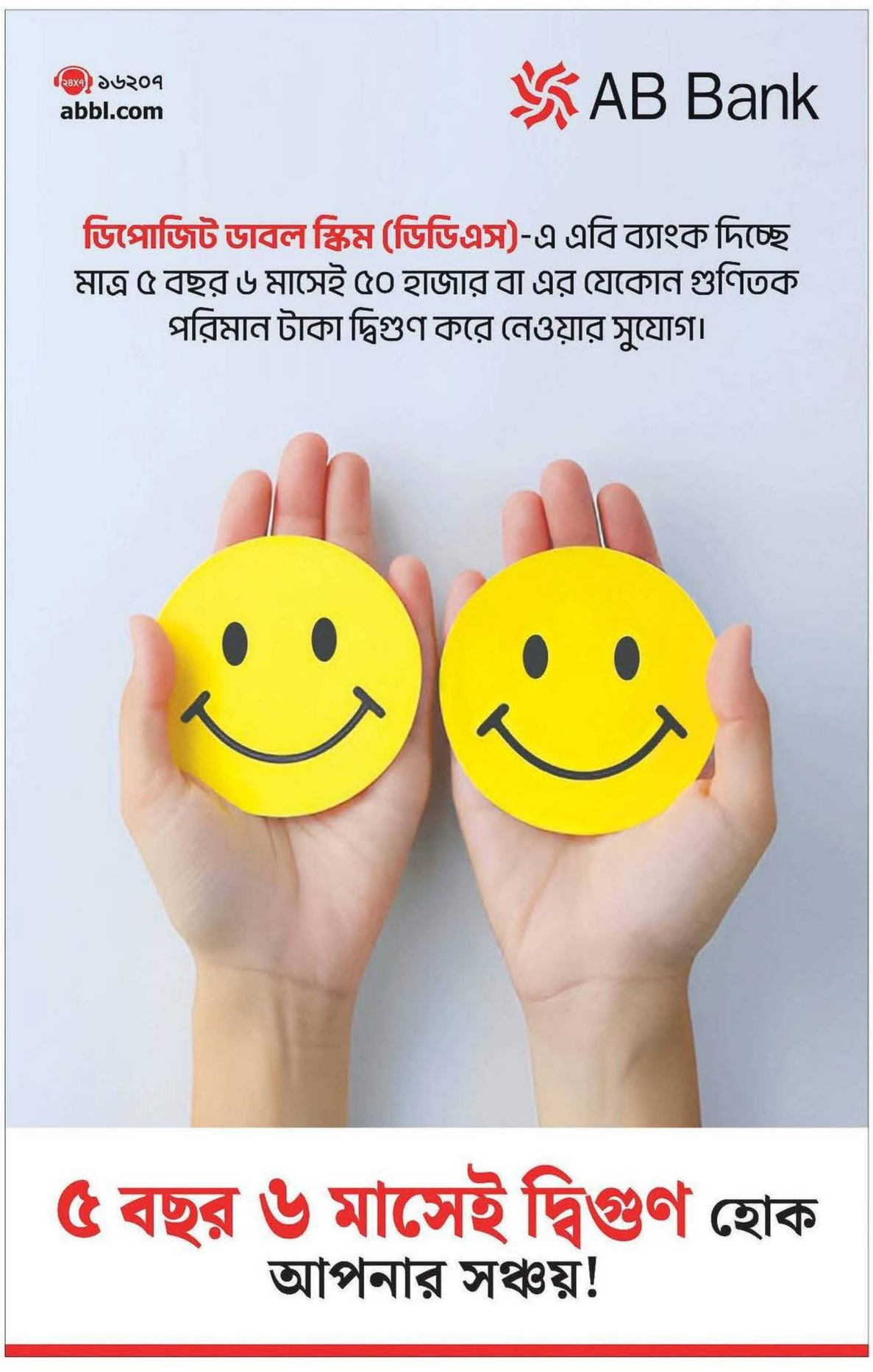

পুলিশের জনবান্ধব ভাবমূর্তির লক্ষ্যে

উম্মে ওয়ারা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক

পুলিশ

> পুলিশকে সংস্কার করতে হলে শুধু পোশাক আর মনোগ্রাম পাল্টালে চলবে না, একই সঙ্গে নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও চাকরিচ্যুতির মতো বিষয়গুলোকে বিরাজনীতিকরণ করতে হবে, আর এটাই হবে প্রস্তাবিত পুলিশ কমিশনের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

জনমুখী, জবাবদিহিমূলক, দক্ষ ও নিরপেক্ষ পুলিশ বাহিনী গড়ে তুলতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার 'পুলিশ সংস্কার কমিশন' গঠন করেছে। জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানে পুলিশ বাহিনীর জনবিরোধী অবস্থান নেওয়ার কারণে সাধারণ মানুষের মনে অনেক দিনের জমে থাকা ক্ষোভ উপচে পড়েছে ৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে। সরকার পতনের পর রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার থানা, ফাঁড়িসহ পুলিশের ২২৪টি স্থাপনা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, ভাঙচুর করা হয়। বেশ কিছু থানায় এখনো পরিপূর্ণভাবে কাজে ফেরেনি অনেক পুলিশ। গত ২৫ অক্টোবর পুলিশ সদর দপ্তর জুলাই-আগস্ট অভ্যুত্থানে নিহত ৪৪ জন পুলিশ সদস্যের তালিকা প্রকাশ করেছে।

এসব ধারাবাহিকতায় নতুন প্রেক্ষাপটে কীভাবে পুলিশ বাহিনীর কার্য পরিচালনা আধুনিক ও জনবান্ধব করা যায়, তা নিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা হচ্ছে। এর ইতিবাচক দিক হচ্ছে, সাধারণ জনগণ এই বিষয়ে তাদের অভিমত ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে পারছে, যা সহিংসতা-পরবর্তী সময়ে পুলিশের প্রতি তাদের ক্ষোভ ও অসন্তোষ কমাতে সাহায্য করবে।

বাংলাদেশ পুলিশ পরিচালিত হয় ১৮৬১ সালের পুলিশ আইনের মাধ্যমে, যা ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রণয়ন করা হয়েছিল। এ ছাড়া ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮; সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২; পুলিশ প্রবিধানমালা বেঙ্গল, ১৯৮৩; পুলিশ রেগুলেশন অব বেঙ্গল (পিআরবি) ১৯৪৩ এবং অন্যান্য আইনের মাধ্যমে পুলিশ বাহিনী দায়িত্ব পালন করে থাকে। খেয়াল করার মতো বিষয় হচ্ছে, প্রতিটি আইনই ব্রিটিশ আমলের, যা ঔপনিবেশিক শাসনের স্বার্থ রক্ষাকে প্রাধান্য রেখে তৈরি করা। তা যদি না-ও হতো, এক-দেড় শ বছরের পুরোনো আইন কখনোই এই সময়ের জন্য কার্যকরভাবে প্রযোজ্য হতো না। বহুদিন ধরে এসব আইন আধুনিকায়ন ও পরিমার্জন করার আলোচনা হলেও কোনো সরকারই তার বাস্তব রূপ দেয়নি।

পুলিশ রিফর্ম প্রজেক্টের (পিআরপি) অধীনে পুলিশ সংস্কারের জন্য প্রস্তাবিত অধ্যাদেশের কথা এ ক্ষেত্রে বলা যায়। এটি বছরের পর বছর কেবল খসড়া হিসেবেই সীমাবদ্ধ আছে। 'বাংলাদেশ পুলিশ অধ্যাদেশ ২০০৭' নামের প্রস্তাবিত অধ্যাদেশের কিছু ধারায় পরিবর্তন এনে ২০১৩ সালে পুনরায় খসড়া প্রণয়ন করা হয়। এই অধ্যাদেশে পুলিশ সদস্যের ওপর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কমানো, পুলিশের জবাবদিহি বাড়ানোসহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু যুগোপযোগী বিধানের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রস্তাবিত অধ্যাদেশে অপরাধের সঙ্গে জড়িত পুলিশ সদস্যদের শাস্তি দেওয়ার জন্য পুলিশ ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিধান রয়েছে এবং মানবাধিকার সমুন্নত রাখার জন্য 'কোড অব কন্ডাক্ট' অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অপর দিকে, এই অধ্যাদেশে, সরল বিশ্বাসে কর্তব্য সম্পাদনের কারণে কোনো পুলিশ কর্মকর্তা দণ্ডিত হবেন না এবং তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে না, এ ধরনের ধারাও সংযোজিত হয়েছে। দায়মোচনসহ এই অধ্যাদেশে স্বাধীনতার নামে পুলিশকে অবাধ ক্ষমতা দেওয়ার অভিযোগে বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন ও সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় বলে জানা যায়। নানাবিধ রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণে অধ্যাদেশটি আর আলোর মুখ দেখেনি। খসড়া পুলিশ অধ্যাদেশের জনস্বার্থের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ধারাগুলো বাদ দিয়ে জনমুখী ও জবাবদিহি বিষয়ের ধারাগুলো বর্তমান সংস্কার কমিশন বিবেচনায় নিতে পারে।

তবে মোটাদাগে বাংলাদেশের পুলিশ বাহিনী বিষয়ে সাধারণ মানুষের প্রধান দুটি সমালোচনার একটি হলো, সরকারি দলের ক্ষমতার হাতিয়ার হিসেবে পুলিশ বাহিনীর কাজ করা ও জনবিমুখ একটি ভাবমূর্তির মধ্য থেকে জনগণের জন্য কাজ করার আকার্যকর চেষ্টা করা। বিপদে পড়লে একজন সাধারণ মানুষ প্রথমেই পুলিশ বাহিনীর সাহায্য চাওয়া বা থানায় যাওয়ার কথা ভাবতে ভয় পায়, বিশেষ করে তাদের অভিযোগ যদি অপেক্ষাকৃত বিত্তবান বা রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে হয়।

সরকারি দলের প্রভাব থেকে পুলিশ বাহিনীকে মুক্ত করতে হলে, প্রাথমিকভাবে পুলিশের জন্য ভিন্ন একটা বিশেষ কমিশন গঠনের চিন্তাভাবনা চলছে বলে জানা গেছে। কমিশনকে অবশ্যই রাজনৈতিক ও দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখতে এর একটি শক্তিশালী কাঠামো গঠনের প্রয়োজন, যেন চাইলেই সরকার এর কোনো মন্ত্রণালয়ের কাজে হস্তক্ষেপ করতে না পারে। ফলে পুলিশকে সংস্কার করতে হলে শুধু পোশাক আর মনোগ্রাম পাল্টালে চলবে না, একই সঙ্গে নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও চাকরিচ্যুতির মতো বিষয়গুলোকে বিরাজনীতিকরণ করতে হবে, আর এটাই হবে প্রস্তাবিত পুলিশ কমিশনের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। কেননা পুলিশ বাহিনীর ওপর সরকারি দলের প্রভাব এমনি এক অপসংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে, যা দীর্ঘ মেয়াদে পরিবর্তন করতে হবে।

এ ছাড়া জনবিমুখ ভাবমূর্তি থেকে জনবান্ধব পুলিশ বাহিনী হতে প্রথমেই ব্রসফায়ার, এনকাউন্টার, তথাকথিত বন্দুকযুদ্ধ বা পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু হওয়ার মতো বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অবিলম্বে বন্ধ করতে যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে। এ ছাড়া পুলিশ সদস্যদের আচরণবিধির সানোন্নয়ন জরুরি যেন সাধারণ জনগণের সঙ্গে সৌজন্য ও সম্মানের সঙ্গে তাঁরা দায়িত্ব পালন করেন। নারীসহ আর্থসামাজিকভাবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব্যক্তিদের নিরাপত্তাবোধ এবং নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করতে পারলে জনবান্ধব একটি বাহিনী হিসেবে পুলিশ বাহিনীও রাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে। জনবান্ধব বাহিনী হওয়ার জন্য যাবতীয় বেআইনি কাজের জন্য পুলিশ বাহিনীর জবাবদিহি নিশ্চিত করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পৃথক কমিশন গঠনের মাধ্যমে এই 'চেক অ্যান্ড ব্যালান্স' প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে দীর্ঘ মেয়াদে তা পুলিশ ও জনগণের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক গড়তে সহায়তা করবে।

এসব দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নের পাশাপাশি এই মুহূর্তে স্বল্পমেয়াদি কিছু পদক্ষেপ নেওয়াও প্রয়োজন। বর্তমান পুলিশবিরোধী মনোভাবের কারণে অনেক থানা পুরোদমে কাজ শুরু করেনি, যার ফলে গত দুই মাসে ফৌজদারি মামলা ও সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করার পরিসংখ্যান নিম্নমুখী। এ ছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগীরা থানায় পর্যাপ্ত সেবা পাচ্ছেন না। চলমান বাস্তবতায় পুলিশ বাহিনীর সামনে ঘুরে দাঁড়ানোর নানা চ্যালেঞ্জ থাকলেও দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে তাদের মনোবল ফেরানো ও হতাহত পুলিশদের পরিবারকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তাদানের বিষয়টি বর্তমান সরকারকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিশ্চিত করতে হবে।

শেষ করার আগে এ কথা বলাও প্রয়োজন যে আমাদের দেশে পুলিশ বাহিনীর সমালোচনা যতটা করা হয়, প্রশংসা সেভাবে করা হয় না। কারণ আমরা প্রত্যাশা করি, জনগণের সেবা করাই পুলিশের প্রধান কাজ, কিন্তু পুলিশের চাকরি কতটা চাপের, তা নিয়ে বাংলাদেশে তেমন কোনো গবেষণা নেই। পুলিশ উপসংস্কৃতির (সাবকালচার) স্বতন্ত্র নানামুখী চাপ, উদ্বেগ, বিপদ ও বিচ্ছিন্নতা একজন শক্তিশালী মানসিক গঠনের মানুষকেও প্রভাবিত করতে পারে, যা নিয়ে আমরা একদমই ভাবি না। সাধারণ মানুষ, মিডিয়া, বুদ্ধিজীবী মহল, রাষ্ট্র সবাই আমরা একটি আধুনিক পুলিশ বাহিনী চাই। কিন্তু পুলিশের মনের যত্ন না নিয়ে একটি 'আধুনিক পুলিশ বাহিনী' নির্মাণ করা আদৌ সম্ভব কি না, তা-ও ভেবে দেখা প্রয়োজন। এ কারণে সাংগঠনিকভাবেই পুলিশ বাহিনীতে প্রফেশনাল মেন্টাল হেলথ সাপোর্ট সেন্টার সহজ প্রাপ্য করা দরকার এবং অন্যান্য সংস্কারের পাশাপাশি মানসিক সাহায্য নেওয়ার বিষয়টাকে উৎসাহিত করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশে শিক্ষা সংস্কার কীভাবে সম্ভব

রাখাল রাহা

শিক্ষাবিষয়ক গবেষক

শিক্ষা

বাংলাদেশের শিক্ষার সব ধারা-উপধারার একত্রীকরণের সুবিধার একটা ইউটোপিয়া নানা সময়ে হাজির করা হয় এবং এর পক্ষে অনেক যুক্তিতত্ত্বও দেওয়া হয়।

বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা অতীতের মতো আবারও এ দেশের মানুষের অধিকার আদায়ে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক কাজটা অনেক রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে সম্পন্ন করেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে একটা বৈষম্যমুক্ত রাষ্ট্র নির্মাণের লক্ষ্যে সমাজের সর্বস্তরে যে আলাপ চলছে, সেখানে শিক্ষা একটা গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে হাজির আছে। আলাপ উঠেছে শিক্ষা সংস্কারেরও।

যা কিছু শিক্ষার দৈনন্দিন রুটিন তৎপরতার বিষয়, সেটাই শিক্ষা সংস্কার নয়। কারণ, যেকোনো খাতের রুটিন কাজ ও তৎপরতার সংকট বা সীমাবদ্ধতাগুলো একটা যোগ্য, দক্ষ ও সৎ ব্যবস্থাপনাকাঠামো গড়ে তোলার মাধ্যমে সহজেই সমাধান করা সম্ভব। কিন্তু সম্ভব নয় সেই খাতের নিজস্ব সংগঠন ও ধারণাগত জায়গাগুলোতে ঐক্য প্রতিষ্ঠার কাজ। আর এটা করা না গেলে শিক্ষা খাতের সংস্কার একেবারেই সম্ভব নয়। বিশেষভাবে আরও যেটা বলতে হবে, বাংলাদেশের জন্য এটা একেবারেই সম্ভব নয়।

এর জন্য প্রথমেই যেটা মনে রাখতে হবে তা হলো, বাংলাদেশের শিক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থা আজ অতি মুমূর্ষু। মুমূর্ষুকে নিয়ে প্রথমেই কোনো উচ্চাভিলাষী স্বপ্ন দেখা যায় না। তাকে প্রথমে দ্রুততার সঙ্গে রোগ নির্ণয় করে সঠিক দাওয়াই দিতে হয়। এ কাজটি সঠিক ও দক্ষতার সঙ্গে করতে পারার ওপরই নির্ভর করছে বাংলাদেশের শিক্ষার ঘুরে দাঁড়ানো অথবা মৃত্যুর দিকে আরও এগিয়ে যাওয়া। তাই শিক্ষা নিয়ে কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল বা সংগঠনের যে ভাবনাই থাক কিংবা সামষ্টিকভাবে যে উদ্যোগই গ্রহণ করা হোক, তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রথমে এই দিকটি ভাবতে হবে।

দ্বিতীয় হলো, যেকোনো খাতের পতিত দশা থেকে উদ্ধারের জন্য অন্তত চারটা ধাপে ভাবতে হয়—জরুরি, স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি। খাতের চরিত্র ও পতনের দশা বুঝে কোন কাজটা কোন ধাপে করা হবে, তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করা, চিহ্নিত কাজ বা পদক্ষেপগুলোর আন্তসম্পর্কের মধ্যে যৌক্তিক সমন্বয় করা এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের সক্ষমতার সঙ্গে সেই খাতের পতিত দশা থেকে উদ্ধারের সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। সুতরাং বাংলাদেশের শিক্ষাকে এই পতিত দশা থেকে উদ্ধার করতে হলে সবাইকে উদ্ধার তৎপরতার এসব ধাপ ও সেগুলোর আন্তসম্পর্ক বুঝতে হবে এবং তার ভিত্তিতে কথা বলতে হবে।

তৃতীয় হলো, বাংলাদেশের শিক্ষায় অনেক ধারার কথা বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে এ দেশের শিক্ষায় মোটাদাগে দুটি ধারা আছে। একটি সাধারণ ধারা এবং আরেকটি মাদ্রাসা ধারা। মোটাদাগেই বলা যায়, সাধারণ ধারা রাষ্ট্র পরিচালিত এবং মাদ্রাসা ধারা সমাজ পরিচালিত। সাধারণ ধারার মধ্যে আবার চারটি বড় উপধারা আছে। বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি মাধ্যম, ইংরেজি ভার্সন ও আলিয়া। অন্যদিকে সমাজ পরিচালিত মাদ্রাসা ধারার মধ্যেও বেশ কিছু উপধারা আছে। যেটা উল্লেখ করা প্রয়োজন, এসব ধারা ও উপধারা মিলিয়ে বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় তিন কোটি। আর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ দেশে তিন কোটি মানুষও নেই। সুতরাং শিক্ষা নিয়ে যেকোনো ভাবনা বা পরিকল্পনা শুধু নিজের গোত্র, বিশ্বাস, একটা স্কুল, প্রতিষ্ঠান বা বিশেষ অভিজ্ঞতার নিরিখে নয়, এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী এবং তাদের ধারা-উপধারার কথা মনে রেখে ভাবতে পারতে হবে।

চতুর্থ হলো, যে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতায় বাংলাদেশের শিক্ষায় এসব ধারার উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে তাকে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে রেখে শিক্ষার উন্নয়নের কথা ভাবা যায়, আবার তাদের একত্র করেও ভাবা যায়। বাংলাদেশের শিক্ষার সব ধারা-উপধারার একত্রীকরণের সুবিধার একটা ইউটোপিয়া নানা সময়ে হাজির করা হয় এবং এর পক্ষে অনেক যুক্তিতত্ত্বও দেওয়া হয়। এসব যুক্তিতত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে বিজ্ঞানের কথা বলা হয়, প্রগতি ও আধুনিকতার কথা বলা হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে শিক্ষা সমাজবিজ্ঞানের বিষয়। বস্তুত কোনো বিজ্ঞানই সমাজবিজ্ঞান নিরপেক্ষ নয়, সাপেক্ষ। বাংলাদেশের শিক্ষাকে বাঁচাতে হলে বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করতে হবে। পদ্মা-ভাগীরথী-গড়াই হয়ে যে প্রবাহ শত বছর ধরে ছুটে চলল, তাকে আবার উল্টো ঘুরিয়ে গঙ্গার অভিন্ন প্রবাহে গিশিয়ে দেওয়াই একমাত্র ভালো এবং সেই ভালো না করা পর্যন্ত আর কিছু ভালো করা যাবে না, এই মত যে সমাজবিজ্ঞানসম্মত নয়, তা সবাইকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

পঞ্চম হলো, বাংলাদেশে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর তার সংবিধানে 'একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার' আকাঙ্ক্ষার কথা বলা হয়েছিল। এর আক্ষরিক অর্থ বা প্রকৃত অর্থ নিয়ে বিতর্ক না করেও বলা যায়, সংবিধান গ্রহণের পর রাষ্ট্র কখনো এটা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এটা নিয়ে বিগত ৫৩ বছরে ব্যাপক কোনো গণ-আন্দোলন হয়েছে তেমনও নয়। তবে সাংবিধানিক এই অঙ্গীকারের সঙ্গে পরবর্তী সময়ে নানা সংগঠনকে 'বিজ্ঞানভিত্তিক' শব্দটা জুড়ে দিতে দেখা গেছে, 'কর্মমুখী' শব্দটাও নানা অনুষঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সংবিধানের অঙ্গীকার এবং তার সঙ্গে যুক্ত এসব পরিপূরক শব্দে শিক্ষার গুণগত কোনো পরিবর্তন না ঘটলেও এগুলোর আপাত ও চূড়ান্তঘাতের শিকার যেসব ধারা বা উপধারা হয়েছে, তারা সরাসরি রাষ্ট্র পরিচালিত শিক্ষা ধারার প্রতিপক্ষ হিসেবেই মূলত সমাজে চিহ্নিত হয়েছে। ফলে এর বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় তারা ক্রমাগতভাবে নিজেদের সংকট আড়ালে রেখে অস্তিত্ব রক্ষার প্রতি সচেতন হয়েছে এবং রাষ্ট্র পরিচালিত শিক্ষার ক্রমানৈরাজ্যকর পরিস্থিতির মধ্যে নিজেদেরকে বিকল্প হিসেবে ভাবতে শিখেছে। শিক্ষা নিয়ে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র পরিচালিত এবং সমাজ পরিচালিত শিক্ষার নানা স্তরের মধ্যে বিরাজমান এই শিক্ষা-পরিস্থিতিটা জরুরিভাবে বুঝতে হবে।

ষষ্ঠ হলো, আমাদের মতো রাষ্ট্রের শিক্ষা-পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য নির্মাণে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক শক্তির বিচিত্র ইচ্ছা ও ইশারা থাকে। তাদের হয়ে এনজিও এবং আইএনজিও নামের নানা ধরনের উন্নয়ন-বাণিজ্যিক সংগঠন কাজ করে। দেশের সরকার সেগুলো মেনে নিয়েই চলে, কারণ এতেই তাদের ক্ষমতাস্বার্থ রক্ষিত হয় তুলনামূলকভাবে অধিক। শুধু তা-ই নয়, ক্ষমতার অপব্যবহার ও বহুবিধ হীনস্বার্থ চরিতার্থের জন্য তারা নিজেরাও শিক্ষা-পরিস্থিতির মধ্যে পরিকল্পিতভাবে হস্তক্ষেপ করে। বাংলাদেশের শিক্ষার সব ধারা-উপধারা কমবেশি এই হস্তক্ষেপের শিকার। সুতরাং সাদা চোখে আমরা শিক্ষার বিভিন্ন ধারাকে যা দেখি এবং দেখে তার বিষয়ে যেভাবে ভালো-মন্দ সিদ্ধান্ত নিই, তা সব সময় সত্য নয়। শিক্ষার এই রাজনীতি না বুঝে শিক্ষা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

সপ্তম হলো, বাংলাদেশের শিক্ষার সব ধারা ও উপধারার মধ্যে সর্বাধিক শিক্ষার্থী রয়েছে সাধারণ ধারার বাংলা মাধ্যমে। বস্তুত বাংলাদেশের ইতিহাস হলো সাধারণ ধারার শিক্ষা

বাকি অংশ ১৭ পৃষ্ঠায়

ভবিষ্যতের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে কিছু পূর্বশর্ত মেনে এর সংস্কার প্রয়োজন। ছবি : প্রথম আলো

১৬ পৃষ্ঠার পর

ধ্বংসের ইতিহাস। আর এই ধ্বংসটা পরিকল্পিত। বস্তুত এর মাধ্যমেই বাংলাদেশ রাষ্ট্র এবং তার সব প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এসব ধ্বংস ও তার পরিকল্পনা যাতে আমরা বুঝতে না পারি, সে জন্য শত্রু হিসেবে শিক্ষার অন্যান্য ধারা, বিশেষ করে সমাজ পরিচালিত মাদ্রাসা ধারার দিকে নেতিবাচকভাবে তাকানোর সংস্কৃতি গড়ে তোলা হয়েছে। বস্তুত বাংলাদেশে শিক্ষার সংকট ধারাভেদে পৃথক এবং সেগুলোর মধ্যে মাত্রাগত পার্থক্যও রয়েছে। কিন্তু এ দিকটা উপেক্ষা করে ঢালাওভাবে বিশেষ ধারা বা উপধারার ওপর বিশেষ বিদ্বেষ সৃষ্টির যে সংস্কৃতি, তা রাষ্ট্রনির্মিত। বাংলাদেশের শিক্ষায় যেকোনো ধরনের ইতিবাচক হস্তক্ষেপ করতে হলে এই সংস্কৃতিকে বুঝে ও মোকাবিলা করে এগোতে হবে।

অষ্টম হলো, শিক্ষা অবস্তুগত সম্পদ। বস্তুগত সম্পদের সঙ্গে এর পার্থক্য হলো এটার ভালো-মন্দ বা বড়-ছোট বিবেচনার মাপকাঠি সুনির্দিষ্ট নয়। তাই সমাজে বস্তুগত সম্পদের ভালো-মন্দ নিয়ে যত সহজে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, অবস্তুগত সম্পদ নিয়ে তা নয়। বস্তুগত সম্পদের কর্তৃত্ব বা মালিকানা বা রক্ষার তাগিদ নিয়ে সমাজে যত আগ্রহ থাকে, অবস্তুগত সম্পদ নিয়ে তা থাকে না। বস্তুত একটা সমাজ কতখানি এগিয়ে তা বোঝা যায়, সেই সমাজে অবস্তুগত সম্পদের গুরুত্ব কতখানি বা এ বিষয়ে মানুষের বোঝাপড়া কেমন তার ধরন দেখে। সে বিচারে বাংলাদেশ একটা পশ্চাৎপদ দেশ। এই পশ্চাৎপদতার কারণ যেটাই হোক, সম্পদ হিসেবে শিক্ষার এই বৈশিষ্ট্য না বুঝে, সে বিষয়ে সমাজের মানুষের ভাবনার স্তর না ভেবে করণীয় করা ঝুঁকিপূর্ণ।

নবম হলো, অবস্তুগত সম্পদ 'শিক্ষা' প্রাপ্তির উপায় হিসেবে অধিকাংশ মানুষ আবার বস্তুগত উপকরণ, অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তককেই বোঝে। সে কারণে মানুষের এই বোঝার জায়গাকে ঘিরেই শিক্ষার দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষ পরিকল্পনা কষে অধিক। সমাজে চিন্তার বিভাজনকে ব্যবহার করে তারা পাঠ্যপুস্তকে এমন সব পাঠ বা ধারণার এমনভাবে সমাগম ঘটায়, যা সেই বিভাজনকেই আরও তীব্রভাবে উসকে দেয়। সেই উসকানিতে তখন শিক্ষার মানে হয়ে দাঁড়ায় অনেকটা বিশেষ কোনো পাঠ থাকা বা না-থাকার মতো বিষয়। বস্তুত কোন পাঠ কোন বিষয়ে কেন পাঠ্য হবে, সেই পাঠে কী কী শিখন-উদ্দেশ্য হাসিল হবে, কীভাবে হবে? এই বোধের জায়গায় তখন পৌঁছানো সম্ভব হয় না। শিক্ষার ভাবনায় পাঠ্যপুস্তকের এই রাজনীতি না বুঝে এগোনো সম্ভব নয়।

দশম হলো, শিক্ষা একটা ইতিবাচক প্রপঞ্চ। শুধু ইতিবাচক নয়, এটা হলো মানবসভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী ইতিবাচক প্রপঞ্চ। অতীতে মানুষের কাঙ্ক্ষিত প্রপঞ্চ থেকে তাদের বঞ্চিত রাখার মাধ্যমে ধ্বংসসাধনের পরিকল্পনা করা হতো। বর্তমানে এটাকে সবার জন্য সুযোগ হিসেবে হাজির রাখার মাধ্যমে ধ্বংসের পরিকল্পনা সাজানো হয়। সবার জন্য যেনতেন কোনো এক ধরনের শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে যদি তার উপযোগী সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন না করা হয় কিংবা যদি পরিকল্পিতভাবে উল্টোটা করে তোলা যায়, তবে পূর্বের অশিক্ষা থেকে সেই সমাজের যতখানি ক্ষতিসাধন করে স্বার্থ হাসিল করা যাচ্ছিল, পরের তথাকথিত শিক্ষা দিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিসাধন করা সম্ভব হয়, এবং একই সঙ্গে বহুগুণ বেশি স্বার্থসিদ্ধিও লাভ করা যায়। আগামীর বাংলাদেশে শিক্ষায় হস্তক্ষেপ করতে হলে এই ইতিবাচক প্রপঞ্চের রাজনীতিটা বুঝে করতে হবে।

একাদশ হলো, শিক্ষায় রাজনীতি, শিক্ষার রাজনীতি এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনীতি—এগুলো পৃথক বিষয়। প্রতিটি বিষয়কেই নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা সম্ভব। শিক্ষায় রাজনীতি সহজেই ধরা যায়, আর শিক্ষার রাজনীতি ইতিবাচক প্রপঞ্চ নির্মাণের মাধ্যমে পরিচালিত হয় বলে সহজে ধরা যায় না। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনীতি বিষয়টা এ দেশে সহজে ধরা যেমন যায়, তেমনি ঐতিহাসিকভাবে ইতিবাচকতার রাজনীতি দ্বারা গভীরভাবে আচ্ছন্ন থাকার কারণে এর নেতিবাচকতার মাত্রাকে সহজে উপেক্ষাও করা যায়। মনে রাখা প্রয়োজন, রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিকতা কখনো সংখ্যাগরিষ্ঠের চাওয়া অনুযায়ী নির্ধারিত হয়, আবার কখনো সংখ্যালঘিষ্ঠের না-চাওয়া অনুযায়ীও নির্ধারিত হয়; কখনো ঐতিহাসিক প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারিত হয়, আবার ঐতিহাসিক প্রয়োজন অনুযায়ী তা বাতিলও করা হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতির চলমান ধারাকে এই নিরিখে বিচার করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

দ্বাদশ হলো, এ দেশের সব স্কুল-কলেজ, কিন্ডারগার্টেন, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি বা বেসরকারি, রাষ্ট্র পরিচালিত বা সমাজ পরিচালিত, বাণিজ্যিক বা অবাণিজ্যিক—তার সবাই যে আমাদের এবং এখানে যারা পড়ছে তারা যে এ দেশেরই নাগরিক বা ভবিষ্যৎ নাগরিক এবং সে কারণেই যেসব ধারার শিক্ষাকে তার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেই মানসম্মত হতে হবে, সেখানের শিক্ষার্থীর জীবন নিরাপদ হতে হবে এবং শিক্ষার পরিবেশ অনুকূল হতে হবে, এটা না বুঝে বা এই দাবিতে একমত না হয়ে এবং এই ধারাগুলোর প্রবাহ ও বিকাশের সুস্থ ধারাবাহিকতার প্রতি চরম অনাস্থা রেখে শুধু ইতিবাচকতার বোধ দিয়ে শিক্ষায় যা কিছু হস্তক্ষেপ করা হবে তাতে যে আরও কুফল ফলতে পারে, তা সবাইকে গভীরভাবে বুঝতে হবে।

পরিশেষে যেটা বলার, শিক্ষা সংস্কারের যত ভালো রূপরেখা বা কাঠামোই ভাবা হোক না কেন তা করা সম্ভব হবে না বা করলেও তা বাস্তবায়ন করে দীর্ঘমেয়াদি সুফল পাওয়া যাবে না, যদি না এই পূর্বশর্তগুলোর বিষয়ে আমরা এখনই মনোযোগ দিতে এবং ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারি।

সব ধারার শিক্ষাকে তার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেই মানসম্মত হতে হবে, সেখানের শিক্ষার্থীর জীবন নিরাপদ ও শিক্ষার পরিবেশ অনুকূল হতে হবে। ছবি : প্রথম আলো

24 years of GOOD BANKING

দেশি ও বিদেশি মানদণ্ডে
ভালো ব্যাংক

সাফল্যমণ্ডিত ২৪ বছরে
যমুনা ব্যাংক অর্জন করেছে
অর্থনৈতিক শক্তিমত্তা, গ্রাহকের
ঝুঁকিহীন বিনিয়োগ এবং
আধুনিক ও উদ্ভাবনী ব্যাংকিং সেবা।

* ২০২৪ সালে ব্যাংকিং খাতে সর্বোচ্চ EPS
* সেরা প্রাইমারি ডিলার ব্যাংক পুরস্কার ৩৬ বার
* শীর্ষ টেকসই (সাসটেইনেবল) ব্যাংক
* AA1 দীর্ঘ মেয়াদি ক্রেডিট রেটিং
* অন্যতম সেরা করদাতা ব্যাংক
* ১৩.৫ লক্ষাধিক গ্রাহক নেটওয়ার্ক

যমুনা ব্যাংক

নারীর সামনে পুরুষালি ধমক

সামিনা লুৎফা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাদের কথাকে গুরুত্ব দিতে হবে। ছবি : প্রথম আলো

বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের ইতিহাস অনেক পুরোনো। এ দেশের নানা আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণের ইতিহাসও অন্তত নতুন নয়। গত শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকেই নারীশিক্ষার আন্দোলনের পথিকৃত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের কথা যেমন আমরা জানি, তেমনি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সশস্ত্র সংগ্রামী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের উদাহরণও আমাদের আছে। পাকিস্তান আমলের শুরু থেকেই ভাষার জন্য লড়াইয়ে লিলি খান বা তেভাগা বিদ্রোহের ইলা মিত্র বা হাজারো সান্তাল চাষি বা ফুলবাড়ীর আন্দোলনকারীদের মতো পূর্ব-নারীদের নাম আমাদের ইতিহাসে জ্বলজ্বল করে।

পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের স্বাধিকার আর মহান স্বাধীনতার লড়াইয়েও বাংলার নারীরা পিছিয়ে ছিলেন না। স্বাধীনতা-পরবর্তী দেশে বরং তাঁদের উপস্থিতি অনেক বছর পর্যন্ত ম্লানতর। তবে ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিক থেকে ১৯৮০-র দশকে বাংলাদেশে দেখা দেয় সত্যিকার অর্থে নারী আন্দোলনের নানা উপদান ও উপকরণ। শ্রমবাজারে নারীর বাধভাঙা অংশগ্রহণ সত্ত্বেও পিতৃতন্ত্রের বেড়াজালে আটক সাধারণ ও প্রান্তিক নারীরা এখনো বাল্যবিবাহের শিকার হন, পড়াশোনা শেষ না করেই বাধ্য হয়ে শ্রমবাজার থেকে ছিটকে যান, সম্পত্তির সমান হিস্যা পান না, অর্থনৈতিক কাজে সমান মজুরি, গৃহস্থালি কাজে সহযোগিতা, সমতার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ ও সন্তানের অভিভাবকত্বও পান না, অথচ শিকার হন লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজনের, আর সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর আসনে তাঁদের হক সামান্যই অর্জিত হয়েছে। যে নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী, তাঁর কর্মক্ষেত্রে মকসুদ যা-ই হোক না কেন, ঘরের কাজ তাঁর পেছন ছাড়ে না কখনোই! তবে আমাদের প্রচলিত বয়ানের মধ্যে নারী হিজাব পরলে কেমন 'জঙ্গি' বা ওড়না না পরলে কেমন 'খারাপ মেয়ে'—এসব পুং-ব্যাখ্যা এমনকি কর্মঠ, উদ্যমী, নিজের-পায়ে-দাঁড়ানো নারীর কর্তাসত্তাকেও নাকচ করে টিকে থেকেছে।

এ রকম পটভূমিতে দাঁড়িয়ে যখন দেখি, ২০২৪ সালের জুলাইয়ে কোটা সংস্কারের জন্য আন্দোলনরত বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া নারীরা সরকারি চাকরিতে নারী কোটা বাতিল চান, তখন প্রসাদ গুনেছিলাম। কারণ, পাঠকেরাও মানবেন যে নারীর ব্রাত্য হয়ে থাকার অনেক জায়গা এখনো রয়ে গেছে, যার কারণে বড় পদে তাঁদের প্রবেশ এখনো বাধাহীন নয়। কাজেই ইতিবাচকভাবে তাঁদের উপস্থিতিকে উৎসাহিত করার দরকার যেমন আছে, তেমন রয়েছে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন, দ্বিভাজিত লিঙ্গপরিচয়ের বাইরের মানুষ, যেকোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং পাহাড় ও সমতলের বিভিন্ন জাতিগত পরিচয়ের মানুষের উপস্থিতির প্রয়োজন।

এর মধ্যে আসে জুলাই অভ্যুত্থান। এ অভ্যুত্থান '৩৬ জুলাই' (৫ আগস্ট) শেখ হাসিনার সরকারের পতনের মধ্যে দিয়ে একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত অতিক্রম করে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন থেকে শিক্ষার্থী-জনতার অভ্যুত্থানে পরিণত এ বর্ষা-জাগরণকালে নারী, ভিন্নধর্ম ও জাতিসত্তা এবং প্রান্তিক বা নন-বাইনারি লিঙ্গপরিচয়ের মানুষসহ সব ধরনের জনগণকে যেমন জোরালো ভূমিকায় দেখা গেছে, তেমনি '৩৬ জুলাই'-এর পর সেই ভিন্নতা বা বৈচিত্র্যের অবদানকে খুব বেশি উদ্‌যাপন করতে আমরা দেখিনি। উল্টো আমরা দেখেছি, ধর্মীয়, লিঙ্গীয়, জাতিগত বা ধর্মের বিভিন্ন ফেরকার তফাতকে সামনে এনে তাঁদের বিরুদ্ধে একরকমের সংঘবদ্ধ সহিংসতা চলেছে দেশজুড়ে। বিশেষত নারী ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জন্য দেশ অনিরাপদ হয়ে উঠেছে। শিল্পস্থাপনা, ভাস্কর্য, শিল্পকলা ভাঙা হয়েছে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ওপর আক্রমণ হয়েছে, মাজার ভাঙা হয়েছে, হিন্দুদের ওপর হামলা ও দুর্গাপূজার আগে প্রতিমা ভাঙচুর হয়েছে, পাহাড়ে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অধিবাসীদের ওপর হামলা ও হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ওপরে নানা রকম বিচারবহির্ভূত শাস্তির নামে প্রতিশোধ নেওয়া ও হিংস্রতা চলেছে। এসবের কোনো ঘটনায় প্রতিবেশী দেশের ইন্ধন ও প্রচারণার আশঙ্কা যদি সত্যও হয়, তবু একটি ঘটনা ঘটলেও তা নিন্দাযোগ্য এবং সরকারের দুর্বলতাকে নির্দেশ করে।

এর মধ্যে ঢাকাসহ দেশের নানা অঞ্চলে নারীর ওপর, তাঁর চলাচল ও পোশাকের স্বাধীনতার ওপর অন্যায় আক্রমণের প্রতিটি ঘটনা নারীসহ প্রান্তিক লিঙ্গপরিচয়ের মানুষকে অনেক বেশি ঝুঁকি ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে ফেলেছে। আইনের শাসনের অভাব সে ঝুঁকিকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। ফলে নানা তরিকার মানুষের নানা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থ আদায়ের কেন্দ্র হয়ে ওঠার বিশৃঙ্খলা নিঃসন্দেহে দেশের জন্য বিপজ্জনক, তবে তা নারী ও প্রান্তিক মানুষের জন্য বেশি বিপজ্জনক। আর যেন কোনো প্রান্তিক মানুষ ক্ষতির শিকার না হয়, তার জন্য কাজ করা 'নারী অধিকারের রাজনীতি'-র প্রধান কর্তব্য।

যদি শুধু নারীদের অবস্থার দিকেও তাকাই, তবে আন্দোলনের পর আমরা নারীদের একটা অধস্তন জায়গায় দেখলাম; যেনবা দ্বিতীয় শ্রেণিতে তাঁদের কথা বা অবদান উল্লেখিত হয়। উদ্‌যাপনে তাঁরা নেই, সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁরা নেই; তাঁরা কেবল যেন রাতের বেলা হলের তালা ভেঙে গিছিল নিয়ে বেরিয়ে বা লাঠি, কাঁদানে গ্যাস, বুলেট উপেক্ষা করে রাস্তায় আন্দোলনে-গিছিলে সামনে থেকে, পুলিশের হাত থেকে আন্দোলনকারীদের উদ্ধার করে বা ডিবি অফিসে আটক থেকে আন্দোলন চাঙা রেখে আবার ফিরে গিয়েছেন আড়ালে।

রাস্তায় প্রাণ দেওয়া শ্রমিকশ্রেণির মানুষদের পরিবারের কথা বা আহত মানুষের আহাজারিও যেন আমাদের নানা নেতৃত্বের উদ্‌যাপনে হারিয়ে গেল। হঠাৎ দেখলাম আহত-নিহত মানুষের তালিকা তৈরি বা তাঁদের জন্য হাসপাতালের সহায়তা দিতে অন্য আরেক দল মানুষ নিরলস স্বেচ্ছাসেবা দিচ্ছেন, যাঁদের মধ্যে নারীদের অংশ কম নয়। অথচ আমরা তাঁদের স্বর শুনিনি বা নারী সমন্বয়কদের তেমন দেখতেও পাইনি। মনে করে, জোর করে করে তাঁদের কথা আলাদাভাবে বলতে হয়, সাংবাদিকের ধরা ফ্রেমেও নারী সমন্বয়কদের উপস্থিতি কম দেখা যায়। এর মধ্যে নাগরিক কমিটি বা বৈষম্যবিরোধীদের আহ্বায়ক কমিটির মুখপাত্র হিসেবে দুজন নারীর থাকা আশা জাগালেও নিন্দুকেরা একে টোকেনিজম বা আলংকারিক উপস্থিতি বলে সমালোচনা করেছেন। এর মধ্যে ফেমিনিস্ট অ্যালায়েন্স বাংলাদেশ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ক্ষুব্ধ নারী সমাজসহ আরও নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন ও নাগরিকেরা নারীদের জন্য বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়তে নানা দাবি, কর্মপরিকল্পনা ও প্রস্তাব করেছেন, যার সিংহভাগই পূরণ হয়নি বা তাদের শঙ্কা সত্যি হয়েছে—নারীরা আরও প্রান্তিক হয়েছেন।

কিন্তু পরিত্রাণের উপায় কী? প্রথমত, নারী ও প্রান্তিকজনের স্বরকে হাওয়া করে দেওয়ার রাজনীতির বিরুদ্ধে সারাক্ষণ উচ্চকিত থাকা, যাঁরা সব আলোচনা বা বয়ান তৈরি করতে কেবল বাঙালি মুসলমান পুরুষ ছাড়া আর কাউকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা মননে স্থান দিতে পারেন না, তাঁদের নিয়মিত প্রতিরোধ করতে হবে। নারী ও প্রান্তিক মানুষের সাফল্য, অর্জন ও অংশগ্রহণকে উদ্‌যাপন করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, দেশের রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর নেতৃত্বে, মনোনয়নে ও প্রতিনিধিত্বে নারী ও প্রান্তিকের উপস্থিতি বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে। সদস্যদের মধ্যে নারী ও সংখ্যালঘু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে হবে।

তৃতীয়ত, সব লিঙ্গপরিচয়ের মানুষের জন্য নিরাপদ কর্মক্ষেত্র, শিক্ষালয়, রাস্তা ও জনপরিসর তৈরি করায় কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে, যেকোনো নিপীড়ন বিশেষত যৌন নিপীড়ন মোকাবিলায় আইন প্রণয়ন করতে হবে, ইতিমধ্যে হওয়া মামলার দ্রুত শুনানি ও বিচার করতে হবে। ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট ও সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট বাতিল করে স্বাধীন কমিশন গঠন করে সাইবার জগতে নারীকে সুরক্ষা দিতে হবে।

চতুর্থত, মজুরি, পদমর্যাদা ও নিয়োগের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করতে হবে; নিরাপদ কর্মপরিবেশ, যাতায়াত ও জীবনের নিরাপত্তা দিতে হবে; সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি, কর্মক্ষেত্রে ও আবাসিক এলাকায় পার্ক, খেলার মাঠ, জাদুঘর ও শিশুদিবাযত্নকেন্দ্রের ব্যবস্থা করতে হবে।

পঞ্চমত, পারিবারিক সম্পত্তি ও উত্তরাধিকারের সমানাধিকার, বিবাহবিচ্ছেদ এবং অভিভাবকত্ব ও লালন-পালনে সমান অধিকার ও দায়িত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

ষষ্ঠত, নারীর নিজের শরীর, জীবন, জীবিকা নির্বাচনে তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণের বাধা অপসারণ করতে হবে। শিশুবয়স থেকে সমতার ধারণা পারিবারিক ও বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শেখাতে হবে, বাল্যবিবাহ বন্ধ করে মেয়েশিশুদের শিক্ষা থেকে ঝরে যাওয়া বন্ধ করতে হবে। যেহেতু যেকোনো কিছুতেই আঘাতটা প্রথমে নারীদের ওপরে আসে, অভ্যুত্থান-পরবর্তী দুর্যোগ থেকে তাঁদের রক্ষা করতে হবে।

শিক্ষার্থী-জনতার অভ্যুত্থানে মূল অংশীজনদের বাদ রেখে অভ্যুত্থানের মূল আকাঙ্ক্ষা বৈষম্যহীন বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করা যাবে না। কারণ, গণতন্ত্রের দিকে যাত্রা করার পূর্বশর্ত সমান মর্যাদা, ইনসাফ ও বহুস্বরিক রাজনৈতিক পরিসর নিশ্চিত করা। কাজেই ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, লিঙ্গ, জাতি ইত্যাদি নির্বিশেষে সব নাগরিকের সহাবস্থান, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সমান মর্যাদা, ইনসাফ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই জুলাই অভ্যুত্থানের মূল আকাঙ্ক্ষা। তা পূরণ করলেই নারীর সামনে হাজির পুরুষালি ও একনায়কতান্ত্রিক ধমকওয়ালারা থামতে বাধ্য হবে; নারী, শ্রমজীবী ও প্রান্তিক মানুষের যাত্রা অবাধ হবে।

> নারীর নিজের শরীর, জীবন, জীবিকা নির্বাচনে তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণের বাধা অপসারণ করতে হবে। শিশুবয়স থেকে সমতার ধারণা পারিবারিক ও বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শেখাতে হবে, বাল্যবিবাহ বন্ধ করে মেয়েশিশুদের শিক্ষা থেকে ঝরে যাওয়া বন্ধ করতে হবে।
> নারী

টেকসই আগামী বিনির্মাণে
ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি

BRAC UNIVERSITY
Inspiring Excellence

স্যার ফজলে হাসান আবেদের শিক্ষা-দর্শন নিয়ে আগামীর পথে
গতানুগতিক শিক্ষার সীমানা পেরিয়ে এক্সপেরিয়েন্সিয়াল লার্নিংয়ে অনন্য
সৃজনশীলতা ও মুক্তচিন্তার পাদপীঠ
শিক্ষা ও গবেষণায় এগিয়ে
সামাজিক ন্যায়বিচার ও বৈশ্বিক শান্তির গবেষণা কেন্দ্র
সুশাসন ও উন্নয়নের থিংক ট্যাংক
নারীর ক্ষমতায়নে অগ্রগণ্য
উদ্ভাবন ও সামাজিক উদ্যোগ বাস্তবায়নে অগ্রগামী

শিক্ষার্থী-বান্ধব সবুজ ক্যাম্পাস
পাবলিক হেলথে চ্যাম্পিয়ন পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতন
সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ, মানবীয় নেতৃত্ব বিকাশ কেন্দ্র

একটি সম্মিলিত স্বাস্থ্যব্যবস্থার স্বপ্ন

আহমদ এহসানুর রহমান

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও গবেষক; আইসিডিডিআরবির মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিভাগের বিজ্ঞানী

স্বাস্থ্য

আপনি কেমন স্বাস্থ্য চান? উত্তরটা অতি সহজ আর প্রত্যাশিত—সুস্বাস্থ্য। আমরা সবাই চাই সুস্বাস্থ্য। কিন্তু প্রশ্নটায় যদি একটা শব্দ যোগ করি, আপনি কেমন স্বাস্থ্যব্যবস্থা চান? বোধ করি এই প্রশ্নের উত্তর আর সহজ ঠেকছে না। আমরা এমন এক স্বাস্থ্যব্যবস্থা চাই, যা প্রত্যেক মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে ও জীবনের যথাযথ মর্যাদা দেয়। আমরা এমন স্বাস্থ্যব্যবস্থা চাই, যা শুধু চিকিৎসার ওপরে নয়, বরং সুস্থ থাকার ওপর গুরুত্ব দেয়।

সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার সেই স্বাস্থ্যব্যবস্থা আমরা কীভাবে অর্জন করব? এ প্রশ্নের উত্তরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটা সাম্প্রতিক স্লোগান আমার কাছে বেশ জুতসই মনে হয়েছে, 'সবার জন্য স্বাস্থ্য আর স্বাস্থ্যের জন্য সবাই।' স্লোগানটির প্রথম অংশ স্বাস্থ্যব্যবস্থার কাছে আমাদের প্রত্যাশা তুলে ধরে। তবে এই স্লোগানের আসল শক্তি লুকিয়ে আছে দ্বিতীয় অংশে—স্বাস্থ্যের জন্য সবাই। সবার জন্য স্বাস্থ্য আমরা তখনই নিশ্চিত করতে পারব, যখন সরকার ও সমাজের সর্বস্তরের সবাই স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেবে—রাজনৈতিক অবস্থান থেকে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং জনগণ ব্যক্তিগতভাবে এর মানোন্নয়নে অংশ নেবে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই স্লোগানের মাহাত্ম্য আরও গভীর। স্বাস্থ্য খাতকে আমরা প্রাধান্য দিই না, স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিই না। এর প্রমাণ, স্বাস্থ্য খাতে আমাদের অপ্রতুল বরাদ্দ। জনপ্রতি মোট দেশজ উৎপাদনের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের ১৫২তম দেশ। অথচ স্বাস্থ্যের জন্য জনপ্রতি খরচের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে ১৬৫তম। স্বাস্থ্যের জন্য এ খরচের বেশির ভাগটা আবার জনগণকে জোগাড় করতে হয় নিজেদের পকেট থেকে। এই সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান আরও পেছনে, বিশ্বে ১৮২তম। যদি আসলেই আমরা স্বাস্থ্য খাতকে প্রাধান্য দিতাম, তাহলে স্বাস্থ্যের জন্য জনপ্রতি খরচের দিক থেকে বিশ্বে আমাদের অবস্থান আর যা-ই হোক জিডিপিতে অবস্থানের চেয়ে পেছনে থাকত না। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, স্বাস্থ্য খাতে প্রতি এক ডলার বিনিয়োগের বিপরীতে একটি দেশের ২৮০ ডলার মুনাফা হয়। বাংলাদেশের মতো একটা উদীয়মান অর্থনীতির দেশে স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ তাই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং জরুরি।

> ১৯৪৯ সালে একটি জার্নাল প্রতিবেদনে তিনি বলেছিলেন, 'হেলথ ইজ এভরিবডিস বিজনেস' অর্থাৎ একটি প্রতিষ্ঠান যদি তার কর্মীদের সুস্বাস্থ্যের পেছনে ব্যয় করে, কর্মীরা তা কাজের মাধ্যমে ফেরত দেবেন।

স্বাস্থ্য খাত তখনই তার প্রাপ্য পাবে, যখন স্বাস্থ্য আমাদের জাতীয় এবং স্থানীয় রাজনীতির অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়াবে; যখন সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠান, সব স্তরের জনগণ স্বাস্থ্য উন্নয়নে এগিয়ে আসবে, অংশগ্রহণ করবে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য বরাবরের মতো উপেক্ষিত থেকে যায়। বাংলাদেশের রাজনীতিতে রাজনীতিবিদদের জন্য একটা বড় সুবিধা হলো, জনগণ স্বাস্থ্যের মতো আপাতনিরীহ বিষয়কে ধর্তব্যের মধ্যে রাখে না। যদি রাখত, তবে তাদেরকে প্রশ্ন করত, 'আপনি যদি নির্বাচিত হন, আপনি আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে কী করবেন? কীভাবে করবেন?' রাজনীতিবিদদের জন্য সেটি হতো একটি লিটমাস পরীক্ষা।

এ দেশে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়নের অঙ্গীকারে সীমাবদ্ধ। জেলায় জেলায় হাসপাতাল তৈরির অঙ্গীকার আর বিনা মূল্যে চিকিৎসার স্বপ্ন দেখানো—এতটুকুতেই তাদের স্বপ্ন সীমাবদ্ধ। উন্নত বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে আসন্ন নির্বাচনে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটদের নির্বাচনী ম্যান্ডেটের অন্যতম একটি অনুষঙ্গ 'স্বাস্থ্য'। ওষুধের 'আউট অব পকেট এক্সপেন্ডিচার' কমিয়ে গ্রাহকের খরচ সীমিত করা, নিম্ন আয়ের এবং লাখ লাখ স্বাস্থ্যবিমাহীন মানুষের জন্য গৃহীত 'অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট', যা 'ওবামাকেয়ার' নামে বিখ্যাত, তা নিয়ে তর্ক হচ্ছে, কীভাবে স্বল্পমেয়াদি স্বাস্থ্যবিমা, স্বাস্থ্য সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্যগত উন্নতি আনা যায়, কীভাবে দেশের মানুষের স্বাস্থ্যসেবার প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ আরও বাড়ানো যায়, তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

প্রতিবেশী দেশ ভারতে কিছুদিন আগে নির্বাচন হয়ে গেল। সে নির্বাচনে কংগ্রেসের ইতিহাসে স্বাস্থ্য নিয়ে প্রায় ২০টি অঙ্গীকার রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ৭৫ শতাংশ মেডিকেল, প্যারামেডিকেল ও শিক্ষকের পদ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোনো মেডিকেল কলেজ খোলার অনুমতি না দেওয়া, অপুষ্টির কারণে বয়স এবং ওজনের সঙ্গে উচ্চতার বৃদ্ধি যাতে রহিত না হয়, সে জন্য দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মিড-ডে মিল চালু করা, চিকিৎসক ও অন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর কোনো রকম আঘাতের বিরুদ্ধে আইন করা ইত্যাদি।

রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে বেরিয়ে যদি প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে আসি, এখানেও দেখা যায় বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জনস্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগের ঘাটতি প্রকট। ফেসবুক, গুগল কিংবা অ্যাপলের মতো বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাস্থ্য খাতে নতুনত্ব নিয়ে এসেছে। গুগলের 'ভেরিলি' স্বাস্থ্যবিমার জন্য বিশেষায়িত পণ্য নিয়ে এসেছে ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজ বাড়ানোর জন্য। ভারতে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিমা সেবা দেওয়া হচ্ছে। অ্যামাজন টেলিহেলথের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকার বাড়াচ্ছে। অ্যাপল স্বাস্থ্য ডেটা নিয়ে কাজ করছে এবং স্বাস্থ্যবিমা কোম্পানিগুলোকে ওই স্বাস্থ্যবিমা পরিকল্পনায় সাহায্য করছে। প্রশ্ন হচ্ছে কেন এসব কোম্পানি জনস্বাস্থ্য নিয়ে এত সচেতন? এর সরল উত্তর হতে পারে 'ব্র্যান্ড ভ্যালু'। স্বাস্থ্য হচ্ছে এমন একটি খাত, যেটি সব স্তরের, সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে যুক্ত করে। মেয়হিউ ডেরিবেরিকে বলা হয় আমেরিকার স্বাস্থ্য শিক্ষার অগ্রদূত। ১৯৪৯ সালে একটি জার্নাল প্রতিবেদনে তিনি বলেছিলেন, 'হেলথ ইজ এভরিবডিস বিজনেস' অর্থাৎ একটি প্রতিষ্ঠান যদি তার কর্মীদের সুস্বাস্থ্যের পেছনে ব্যয় করে, কর্মীরা তা কাজের মাধ্যমে ফেরত দেবেন। আমাদের দেশের বড় বড় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এ ধরনের উদ্যোগ শূন্যের কোঠায়।

রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণই কি শেষ কথা? সবার জন্য স্বাস্থ্য আর স্বাস্থ্যের জন্য সবাই—এই উক্তির আলোকে ব্যক্তিপর্যায় থেকেও স্বাস্থ্যোন্নয়নে এগিয়ে আসা জরুরি। সেটি কীভাবে হতে পারে, সে উদাহরণও আমাদের সামনে আছে। বিল গেটস ও তাঁর সাবেক স্ত্রী মেলিন্ডা ফ্রেঞ্চ তাঁদের ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বৈশ্বিক টিকাদানপ্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করা, সংক্রামক রোগ মোকাবিলা এবং বিশেষ করে বৈশ্বিক পোলিও নির্মূল করতে বিলিয়ন ডলার উৎসর্গ করেছেন।

স্বাস্থ্যসেবা শুধু চিকিৎসা নয়, জনগণের সুস্থ থাকাকে প্রাধান্য দেয়। যে মুহূর্তে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে স্বাস্থ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে উঠবে, দেশের মানুষের কাছে স্বাস্থ্য নিয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের জবাবদিহির সংস্কৃতি গড়ে উঠবে, সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠান ও দল-মত-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে জনগণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে স্বাস্থ্য উন্নয়নে সচেতন এবং মানবিক হয়ে উঠবে, নিজেদের মধ্যে থাকা হাজারো দ্বন্দ্বের থেকে স্বাস্থ্যের জন্য তর্কবিতর্ক প্রধান হয়ে উঠবে, তখন আমরা আমাদের স্বপ্নের স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারব—যেটি প্রকৃত অর্থেই হয়ে উঠবে সবার জন্য স্বাস্থ্য আর স্বাস্থ্যের জন্য সবাই।

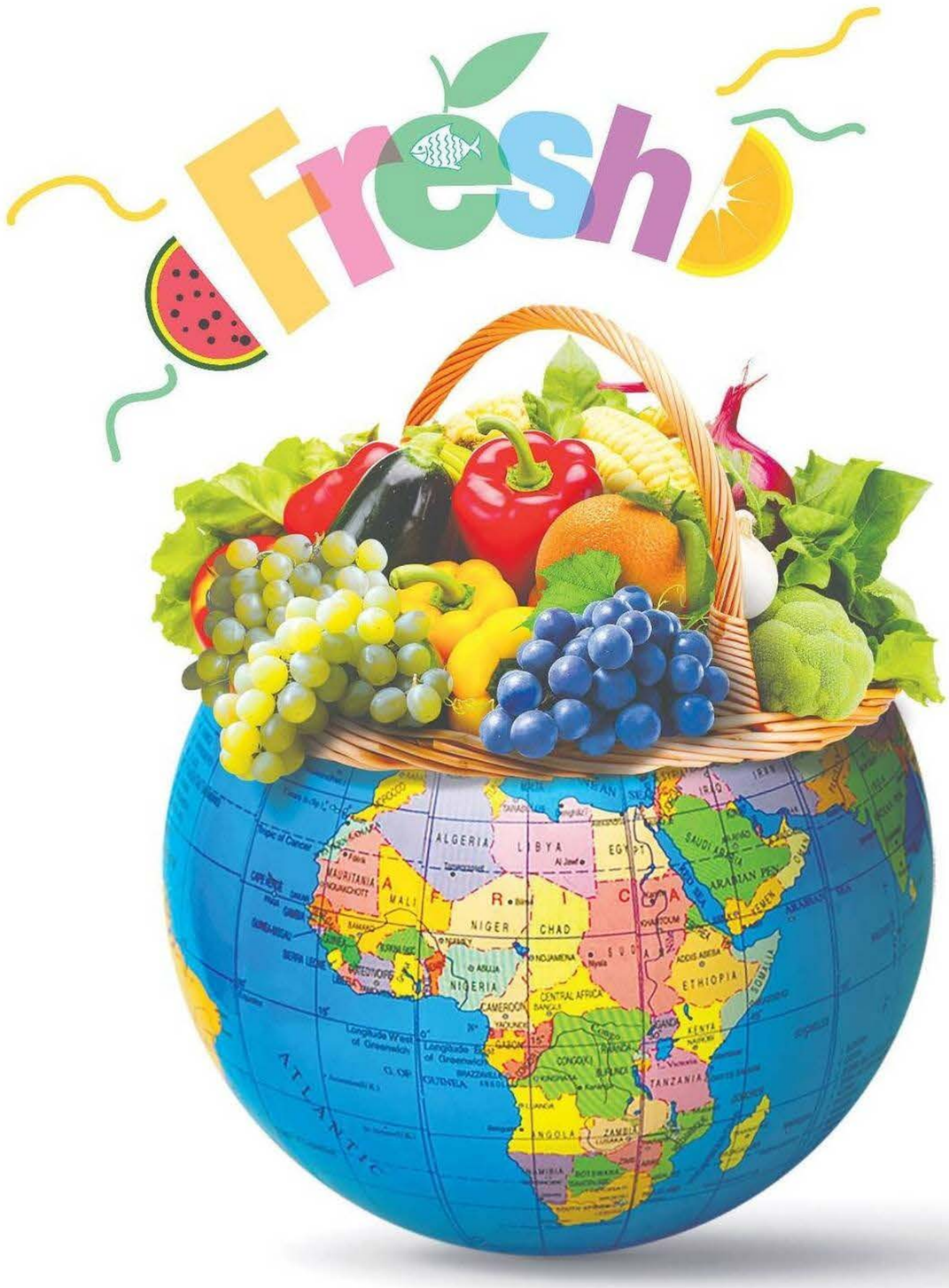

সেক্যুলার নাকি ইনক্লুসিভ

রায়হান রাইন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক

ধর্ম

গণ-অভ্যুত্থানের সময় ‘সেক্যুলার বাংলাদেশ চাই’ লেখা একটি দেয়াললিখনে ‘সেক্যুলার’ শব্দটি কেটে পাশে লেখা হয়েছিল ‘ইনক্লুসিভ’। অর্থাৎ সেক্যুলার নয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ চাই।

গণ-অভ্যুত্থানের পর অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে। বগুড়া সরকারি আজিজুল হক কলেজ চত্বরে একটি দেয়ালচিত্র। ১৩ আগস্ট ২০২৪। ছবি : সোয়েল রানা

গণ-অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশের জনগণ রাষ্ট্রীয় জবরদস্তি ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ববাদকে প্রত্যাখ্যান করেছে। দেশে আবারও কোনো স্বৈরাচারের উত্থান ঘটুক, এটা তারা চায় না। তাদের চাওয়া, বাক্‌স্বাধীনতা এবং জীবনের নিরাপত্তাসহ অন্যান্য মৌলিক নাগরিক অধিকার কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠিত হোক। আমরা দেখতে পাচ্ছি, ফ্যাসিবাদের উত্থান ঠেকাতে অন্তর্বর্তী সরকার রাষ্ট্র সংস্কারের কাজ করছে। সংবিধান, আইন বিভাগ, জনপ্রশাসনসহ নানা ক্ষেত্রে কাজ করছে বিভিন্ন কমিশন। এসব সংস্কারের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থার কিছু বদল ঘটতে পারে, কিন্তু দেশের ইতিবাচক রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন।

সমাজ সংগঠনের একটি বড় উপাদান ধর্ম, সে কারণে গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী বাংলাদেশে ধর্ম প্রশ্নটির মীমাংসা কী হবে, তা নিয়ে নানা রকম আলোচনা চলছে। অভ্যুত্থানকালীন স্লোগান, গ্রাফিতি ও দেয়াললিখনে দাবি উঠেছে, ‘ইনক্লুসিভ বাংলাদেশ চাই।’ এ ছাড়া বাংলাদেশে গিছিলে আছে নানা রকম পতাকা, ধর্ম প্রশ্নের মীমাংসায় তাদেরও আছে বিভিন্ন রকম চাওয়া।

গণ-অভ্যুত্থানের সময় ‘সেক্যুলার বাংলাদেশ চাই’ লেখা একটি দেয়াললিখনে ‘সেক্যুলার’ শব্দটি কেটে পাশে লেখা হয়েছিল ‘ইনক্লুসিভ’। অর্থাৎ সেক্যুলার নয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ চাই। দেয়াললিখনের এই নতুন দাবিটি দেখে যে প্রশ্ন প্রথমেই মনে আসে, সেটা হলো ধর্ম প্রশ্নে সেক্যুলার হওয়া কি অন্তর্ভুক্তিমূলক হওয়ার বাইনারি? আরও কিছু জিজ্ঞাসা এর সঙ্গে যুক্ত, যেমন অন্তর্ভুক্তিমূলক হওয়ার বাস্তব প্রেক্ষিতটি ঠিক কেমন হবে? ধর্ম প্রশ্নটির মীমাংসা সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই–বা কী রকম হবে?

আমাদের দেশে সেক্যুলার কাজ এবং সেক্যুলার হয়ে ওঠার একাধিক অর্থ প্রচলিত আছে। একইভাবে ধর্ম কথাটার তাৎপর্য এবং ধর্মীয় কাজের পরিসীমা নিয়েও আছে নানা মত। পারিভাষিক ও ব্যবহারিক অর্থের এসব ভিন্নতা ধর্ম প্রশ্নটির সঙ্গে সমাজ-রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ণয়কে প্রায়ই জটিল করে তোলে। কিছু দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। সাধারণভাবে ‘সেক্যুলার’ কথাটি দিয়ে মানুষের কাজের একটা শ্রেণিকে বোঝানো হয়, যেমন ফুটবল খেলা, পরিবেশ আন্দোলনে যোগ দেওয়া, বাড়ি বানানো—এগুলো সেক্যুলার কাজ। আমরা দৈনন্দিন জীবনে যেসব কাজ করি, তার বেশির ভাগই এই শ্রেণির। অন্যদিকে নামাজ পড়া, রোজা রাখা, তীর্থযাত্রায় যাওয়া, কনফেশন বক্সের ভেতর দাঁড়িয়ে পাদরির সামনে পাপ স্বীকার করা—এগুলো ধর্মীয় কাজ।

আমরা ধর্মীয় বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে গিয়ে যা করি, সেটা অধর্ম, যেমন খ্রিষ্টীয় দশ নিষেধাজ্ঞার বরখেলাপ করা। একই ব্যক্তি নামাজ পড়েন, আবার বাড়িও বানান। এই অর্থে সেক্যুলার কাজের সঙ্গে ধর্মীয় কাজের বিরোধ নেই। কিন্তু কেউ যদি বাড়ি বানাতে গিয়ে বলেন, অন্য ধর্মের কারও সঙ্গে যৌথভাবে বাড়ি বানাবেন না। তাহলে আমরা তার এই মনোভাবে সাম্প্রদায়িকতা আছে বলে ভাবতে পারি। আবার কেউ যদি বলেন, অন্য ধর্মের কারও সঙ্গে বাড়ি বানাতে তার কোনো সমস্যা নেই। তাহলে তিনি নিশ্চয়ই অন্তর্ভুক্তিমূলক। মনে রাখা দরকার, উভয় ক্ষেত্রেই কাজটা ছিল সেক্যুলার।

এ দেশে সেক্যুলার কথাটির আরেকটা অর্থ বেশ প্রচলিত। এই অর্থটা দাঁড়িয়েছে কট্টরপন্থী সেক্যুলারদের মাধ্যমে, যাঁরা সেক্যুলার কাজগুলোকেই একমাত্র যুক্তিসংগত কাজ মনে করেন। তাঁরা ধর্ম বলতেই বোঝেন সাম্প্রদায়িকতা। তাঁদের কাছে সেক্যুলার হওয়া মানে বিজ্ঞানমনস্ক কিংবা জড়বাদী হওয়া। যুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাঁরা এমন একটা একপেশে বয়ান খাড়া করেন যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ধর্মীয় শক্তিকে পরাজিত করে। এই কট্টরপন্থী সেক্যুলারদের মধ্যে ধর্মীয় কাজ নিয়ে বিদ্বেষভাব আছে। একই সঙ্গে আছে অসহিষ্ণুতা ও আক্রমণাত্মক মনোভাব। ধর্ম নিয়ে তাঁদের এই অসহিষ্ণুতা ও বিদ্বেষভাব এ দেশে ধর্মীয় উগ্রবাদ বিস্তারে এবং ধর্মীয় উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলোকে সংগঠিত করতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। আজকে যে অন্তর্ভুক্তিমূলক হওয়া সেক্যুলার হওয়ার বাইনারি হয়ে উঠেছে, সেটা ঘটেছে এই কট্টরপন্থী সেক্যুলারদের কারণে এবং গণ-অভ্যুত্থানের আগে থেকেই এসব সেক্যুলারের ব্যাপারে একটা নেতিবাচক মনোভাব প্রবল হয়েছে। কিন্তু সেক্যুলার ধারণার উদারপন্থী অর্থের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তিমূলক হওয়ার কোনো বিরোধ নেই।

রাষ্ট্রধারণার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক ঠিক কোথায়? রাষ্ট্রের প্রধান কাজ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। এ ছাড়া জনগণের নিরাপত্তা দেওয়ার পাশাপাশি সরকারকে দেশের মানুষের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হয়, পরিবেশ-প্রকৃতি রক্ষা করতে হয়—এগুলোর কোনোটাই ধর্মীয় কাজ নয়, কিংবা এগুলোর সঙ্গে ধর্মীয় কাজের কোনো বিরোধ নেই। উপরন্তু ধর্ম কথাটা এমন ব্যাপক অর্থে একসময় ব্যবহৃত হয়েছে, যেমনটা দেখা যাবে ব্রিটিশ উপনিবেশপূর্ব বাংলার ইতিহাসে মানুষের সেক্যুলার কাজগুলোকেও ধর্ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেত। ধর্মের এই অর্থটি কর্তব্যবোধের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন। এই অর্থে কোনো রাজা যদি রাজকার্যে কর্তব্যপরায়ণ থাকেন, তাহলে তিনি রাজধর্ম পালন করছেন। একইভাবে কোনো লোক যখন সাংসারিক কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেন, তখন তিনি সংসারধর্ম পালন করছেন।

কিন্তু ধর্ম নিয়ে সংকট ঘনীভূত হয় যখন কোনো ধর্মভিত্তিক দল বা গোষ্ঠী সেক্যুলার কাজগুলোকে তাদের নিজের সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিধিবিধানের ভেতর দিয়ে দেখতে চান। ধর্মের যেহেতু একটা সামাজিক ক্ষমতা আছে এবং আছে একটা সাংস্কৃতিক পরিচয়, ফলে তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রবাসনা তৈরি হয়। রাষ্ট্রের কাজ, যদিও সবই সেক্যুলার এবং জনপরিসরের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু ধর্মীয় কর্তৃত্ব এগুলোকে ধর্মীয় বিধিবিধানের ভেতর দিয়ে দেখতে চায় এবং রাষ্ট্রের কাজকে ব্যক্তিগত পরিসর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়, যা নিশ্চিতভাবেই নাগরিকদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং ধর্মীয় ক্ষমতার এই দ্বন্দ্ব নানা দেশের ইতিহাসে ছড়িয়ে আছে। ইউরোপের ইতিহাস থেকে কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে, যেমন প্যাগানদের সময়ে ধর্মগুরুরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতি আনুগত্যে ধর্মীয় বিধানের কোনো বরখেলাপ দেখতে পেতেন না। কিন্তু খ্রিষ্টধর্মের সামাজিক ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ায় একসময় দাবি ওঠে, শাসকদের থাকতে হবে গির্জার কর্তৃত্বের অধীনে। বারো ও তেরো শতকজুড়ে এই নাটকীয় দ্বন্দ্ব চলেছে পোপ এবং রাজাদের মধ্যে। তেরো শতকে পোপদের ক্ষমতা বাড়লেও চৌদ্দ শতকে গিয়ে সিভিল কর্তৃত্ব ক্রমে মর্যাদাপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং জাতীয়তাবাদের উত্থান, আইনি ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং তাত্ত্বিক বিতর্কের ভেতর দিয়ে একসময় পোপদের ক্ষমতা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশ যেমন কেবল বাঙালির বাসভূমি নয়, তেমনই এ দেশ এককভাবে কেবল মুসলমানের দেশও নয়, এ দেশে বিভিন্ন জাতিসত্তার মানুষের সাংস্কৃতিক পরিচয়ের মধ্যে নানা বৈচিত্র্য আছে। কাজেই বাংলাদেশকে জাতিরাষ্ট্র হিসেবে দেখার মধ্যে জবরদস্তি আছে। একইভাবে কোনো ধর্মীয় বিধিবিধান দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতাকে দেখলেও জনগণের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি হবে এবং ফলাফল হিসেবে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের উত্থান ঘটবে। রাষ্ট্রের কাজগুলোকে হতে হবে সেক্যুলার এবং এর ব্যবস্থা হবে গণতান্ত্রিক। জনগণের সাধারণ স্বার্থগুলো রক্ষা করাই হবে রাষ্ট্রের প্রধান কাজ এবং এর ভিত্তি হবে জনগণের সাধারণ অভিপ্রায়। বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষ যাতে তাদের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড কোনো বাধা ছাড়াই করতে পারে, রাষ্ট্র তা নিশ্চিত করবে।

অন্যদিকে আমরা যদি সমাজ থেকে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা এবং ধর্মের নামে সৃষ্টি হওয়া বিভেদ-বঞ্চনা দূর করতে চাই, তাহলে আমাদের প্রতিদিনের চর্চা থেকে প্রতিদিনের ভাষা ও আচরণ থেকে, আমাদের শিক্ষণ থেকে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বীজগুলোকে উপড়ে ফেলতে হবে। কারণ, এটা স্পষ্ট যে জনগণের প্রতিদিনকার চর্চার ভেতর দিয়েই সাম্প্রদায়িকতার জমিন প্রস্তুত হয়। এই চাষাবাদ বন্ধ করা না গেলে রাজনৈতিক শক্তিগুলোর পক্ষে সাম্প্রদায়িক বিভেদকে তাদের রাজনৈতিক সুবিধা হাসিলে ব্যবহার করা খুব সহজ।

সর্বোপরি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতিক চর্চার ভেতর সহিষ্ণুতা, দয়া ও সম্প্রীতির পরিসর সৃষ্টি করতে হবে, যাতে সমাজের মানুষ ভিন্নমত এবং বিশ্বাস নিয়ে সহাবস্থান করতে পারে—এটাই অনেকান্তবাদ। আমাদের সমাজকে অনেকান্তবাদী হয়ে উঠতেই হবে, কারণ, যেকোনো একান্তবাদই কর্তৃত্বপরায়ণ এবং জবরদস্তিমূলক।

ক্রোড়পত্র সমন্বয়কারী : পল্লব মোহাইমেন, অঙ্গসজ্জা : আনিসুজ্জামান সোহেল, গ্রাফিকস : আমিনুল ইসলাম

16434
aibl.com.bd

মুদারাবা
ডাবল বেনিফিট
ডিপোজিট স্কিম

জমা রাখুন
আস্থার সাথে
দ্বিগুণ হবে
৫ বছর ৬ মাসে

- ন্যূনতম জমা ১ লাখ টাকা
- মুনাফার হার ১৩.৭৮% (প্রাক্কলিত)
- বিধি মোতাবেক শুল্ক/কর কর্তন করা হবে

মান্থলি
প্রফিট বেজড
টার্ম ডিপোজিট স্কিম

মুনাফা হবে
শরীয়াহ্‌ভিত্তিক সঞ্চয়ে
প্রতি লাখে প্রতি মাসে
সম্ভাব্য মুনাফা ১০০০ টাকা

- ১ লাখ টাকা বা এর তদূর্ধ্ব
  যেকোনো পরিমাণ আমানত জমা করা যাবে
- মেয়াদ: ২, ৩ ও ৫ বছর
- বিধি মোতাবেক কর/শুল্ক কর্তন করা হবে

মুদারাবা
ফরেন কারেন্সি
ডিপোজিট একাউন্ট

আয় করুন
বিদেশে
নিরাপদে জমা রাখুন দেশে
অফশোর ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে

- ডলার, ইউরো ও পাউন্ডে আমানত জমা করার সুবিধা
- সম্পূর্ণ আয়করমুক্ত
- মুনাফার হার সর্বোচ্চ ৭.৪৪% (প্রাক্কলিত)
- একাউন্ট পরিচালনায় কোনো ব্যয় নেই
- মেয়াদ: ৩ মাস হতে ৫ বছর
- জমাকৃত অর্থ দেশে ব্যয় ও বিনিয়োগ করা
  এবং যেকোনো সময় বিদেশে ফেরতের সুবিধা

আল-আরাফাহ্
ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.

aib
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি.
Al-Arafah Islami Bank PLC.
সততাই শরীয়াহ